স্বস্তিকা

দাম : সাত টাকা
৬৫ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ২৭ আগষ্ট - ২০১২
১০ ভাদ্র - ১৪১৯

জন্মশতবর্ষে অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৭

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আক্ষরিক অর্থেই 'লুঠ' করছে দেশের সম্পদ □ ৯

রাজ্য কি একদলীয় একনায়কতন্ত্রের পথে যাচ্ছে? □ ১০

মাস্টারমশাই কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী : একজন আদর্শ শিক্ষক ও সংগঠক □ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী □ ১১

কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতি □ শঙ্করীপ্রসাদ বসু □ ১৩

অমলিন স্মৃতি যেথা □ ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ □ ১৫

আমার বাবা ছিলেন সকলের মাস্টারমশাই □ ঋতা চক্রবর্তী □ ১৭

এক আত্মস্থ মানুষ □ বিজয় আঢ্য □ ১৯

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক' □ রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক □ ২১

মল মাস কি ও কেন? □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২

১২৫ বছরে মা সারদার স্মৃতিধন্য বৃন্দাবনের কালাবাবুর কুঞ্জ □ নিমাই মুখার্জী □ ২৩

খোলা চিঠি : বিধানসভায় সিনেমার ডায়লগ! কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ □ সুন্দর মৌলিক □ ২৭

অসম : কংগ্রেসের জন্যই সম্ভব হয়েছে এই নীরব অনুপ্রবেশ □ কাঞ্চন গুপ্ত □ ২৯

মুখের ক্যান্সারে ভারত বিশ্বের রাজধানী □ সাধন কুমার পাল □ ৩০

নিয়মিত বিভাগ

প্রাসঙ্গিকী : ৮ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২৮ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ রঙ্গম : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮-৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

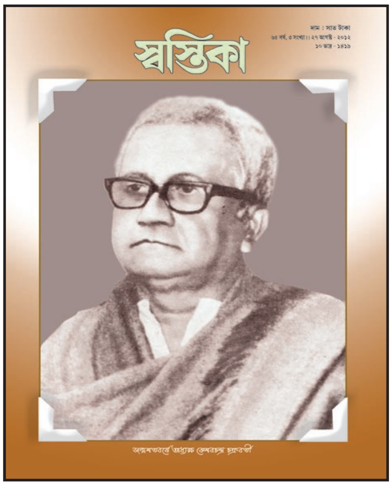

জন্মশতবর্ষে অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী

পৃঃ ১৩-২১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১০ ভাদ্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২৭ আগষ্ট - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা-র বিশেষ বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

স্বস্তিকা একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নির্ভীক সংবাদ সাপ্তাহিক। আগামী ৯ আগস্ট, ২০১২, শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৫ বছরে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে স্বস্তিকা-র বিশেষ নতুন বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানের সময়কাল ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

সকল পাঠক-বন্ধুদের প্রতি বিনম্র নিবেদন এই যে, আপনি নিজে এই পত্রিকার গ্রাহক হোন ও অন্যদের গ্রাহক হতে অনুপ্রাণিত করুন। স্বস্তিকা-র বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা মাত্র। অভিযান চলাকালীন এবং সর্বশেষ ৭ই অক্টোবর, ২০১২-র মধ্যে গ্রাহকের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহকমূল্য স্বস্তিকা দপ্তরে জমা করে রসিদ সংগ্রহ করুন। এর ফলে এবছরের স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা পেতে সুবিধা হবে। চেক বা ড্রাফট্ **Swastika** -এই নামে লিখে স্বস্তিকার ঠিকানায় পাঠাবেন। এছাড়া স্বস্তিকা-র নামে মানিঅর্ডার যোগেও টাকা পাঠাতে পারেন। ঠিকানা— ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬।

আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই পত্রিকা ৬৫ বছর অতিক্রম করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় :

অগ্নিগর্ভ অসম

সংবাদমাধ্যমের দৌলতে অসমের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির কথা আর অজানা নয়। দীর্ঘদিন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দিলে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে যেতে পারে, অসম তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এ নিয়ে আলোকপাত করেছেন **স্বপন দাশগুপ্ত, বাসুদেব পাল** প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংসদ কি দুর্নীতিবাজদেরই আড্ডাখানা হইবে?

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিবাদের সমালোচনায় মুখর হইলেন নবনির্বাচিত মাননীয় রাষ্ট্রপতিমহোদয়। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর যদি এই ধরনের আক্রমণের ঘটনা ঘটিতেই থাকে তাহা হইলে দেশ এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দিকে আগাইয়া যাইবে। এখন প্রশ্ন হইল দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেই যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আক্রমণ হইতেছে বলিয়া কান্নাকাটি করা হইতে থাকে তবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেরই উচিত দুর্নীতিমুক্ত হওয়া। লোকপাল গঠন এবং কালোটাকা দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বাবা রামদেব এবং আন্না হাজারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়িয়া আন্দোলনে সামিল হইয়াছেন। ইঁহারা আন্দোলন করিতেছেন অহিংস উপায়ে। ইঁহারা কেহই সংসদ ভবন সুপ্রীমকোর্ট অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে সংবিধানের স্তম্ভ হিসাবে ধরা হইয়া থাকে তাহা আক্রমণ করেন নাই। বরঞ্চ সংসদ ভবন যাহারা আক্রমণ করিয়াছিল কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের জামাই আদরে পুষিতেছে। তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের এই কান্নাকাটি কেন? বাবা রামদেব যখন কালো টাকা দেশে ফিরাইয়া আনিবার দাবিতে প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছিলেন তখন বর্তমান রাষ্ট্রপতি ছিলেন অর্থমন্ত্রকের দায়িত্বে। তিনি সেই সময় কালো টাকা জমাকারীদের বাঁচাইতে যে প্রয়াস চালাইয়াছিলেন সে কলঙ্কিত ইতিহাস সকলেরই জানা। পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সংসদ বা 'আইনসভার প্রতি প্রশাসনের দায়বদ্ধতা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে হয়তো এই কারণেই বলিয়াছেন 'যাঁহারা নিজেরা জীবনে স্যাক্রিফাইস করেন নাই তাঁহারাও জ্ঞান দিতেছেন।' তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন 'বিকাইয়া যাওয়া রাজনীতিকরা যদি দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল মনোনয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন তাহা কি আদৌ সমর্থনযোগ্য? 'গণতন্ত্রের নামে আমরা কোথায় আগাইয়া চলিতেছি'। এই সকল প্রশ্নই পরোক্ষে বাবা রামদেব তুলিয়াছেন। গণতন্ত্রের বোরখা গায়ে চাপাইয়া আমরা দুর্নীতির কোন অতল সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছি। ক্যাগ রিপোর্টে কয়লা কেলেঙ্কারি ফাঁস হইয়াছে। সরকারের লোকসান হইয়াছে ১.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা। রিপোর্টে বলা হইয়াছে এই দুর্নীতির ফলে কতিপয় প্রথমসারির বেসরকারি সংস্থা রাতারাতি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা উপার্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কারণ সরকারের তরফে নিলাম না ডাকিয়া কয়লা ব্লকগুলি বণ্টন করা হইয়াছিল। এই কেলেঙ্কারির প্রতিবাদ করিলেই বিভ্রান্তিকর গল্প বলিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলে তাহা কতটা শোভন?

রাষ্ট্রপতি নিজেও অবশ্যই জানেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত। তাহার উচিত দুর্নীতি দূর করিবার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাহা না করিয়া তিনি যদি যাহারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অহিংস উপায়ে আন্দোলন করিতেছে তাহাদের সমালোচনা করিতে থাকেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি নামক পদটিই কলঙ্কিত হইবে। অহেতুক সমালোচনা করিয়া তিনি নিজেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলঙ্কিত করিতেছেন। এই সরকারের দুর্নীতিগুলি আড়াল করা রাষ্ট্রপতি পদের পক্ষে অশোভন। সার্বিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ যুক্তিসঙ্গত এবং তাহা গণতন্ত্রকেই মজবুত করিয়া থাকে। সংসদ 'জনগণের প্রাণ', 'ভারতের আত্মা' হইলে সাংসদদের অবশ্যই সৎ সংযমী দায়িত্ব পালন করা উচিত। ভারতের আত্মা চৌর্যবৃত্তিকে সমর্থন করিতে পারে না, ভারতের জনগণ চৌর্যবৃত্তিকে ঘৃণাই করে। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠগ্রহণ আরম্ভ হইয়া থাকে 'যে চুরি করে সবাই তাহাকে ঘৃণা করে' এই বাক্যগুলির মাধ্যমে। ভারতীয় আইনের ফাঁদ কাটিয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের ফাঁক দিয়া তিনি যে মহামান্যই হউন না কেন শিক্ষার পাঠক্রমের ওই বাক্যগুলি তাহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কারণ তাহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ'। —সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যা কখনও জয়লাভ করে না, সত্যের দ্বারাই দেবযানমার্গ লাভ হয়। সকলেই সত্যের পতাকা উড়াইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা কেবল দুর্বল ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জন্য। তোমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমাপূজক গরীব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেছে, ভাবিতেছে— তোমরা ভারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পারো; আজ সে যদি ঘুরিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাও কোথায়? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাকো, অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিয়া চীৎকার করিতে থাকো; দুর্বল মানুষ তো চিরকালই চীৎকার করিয়া থাকে; যে আমাকে পরাস্ত করিবে, সেই নাস্তিক!

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বালুরঘাটে শহীদ চুরকা মুর্মুর নামে ছাত্রাবাস

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অদ্বৈতচরণ দত্ত।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আজ পর্যন্ত বনবাসী কিশোর বীর শহীদ চুরকা মুর্মুর স্মৃতিরক্ষার্থে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার কিছুই করেনি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। অথচ বি এস এফ জওয়ানদের সঙ্গে গুলির বাক্স বহন করতে গিয়েই চুরকার মৃত্যু হয়, পাকিস্তানী সেনাদের গুলি চুরকা-কে ঝাঁঝরা করে দেয়। ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট ওই ঘটনা ঘটেছিল বালুরঘাট শহরের কাছে চকরামপ্রসাদ গ্রামে। কোনও সরকারই চুরকা-র পরিবারের জন্য কোনও কিছু করেনি। চুরকার বলিদান দিবসে এভাবেই কড়া সমালোচনা করলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস রচয়িতা জে এল পি বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের বর্তমান শিক্ষক সুমিত ঘোষ। তিনি অবশ্য তাঁর বইয়ে চুরকা-কে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি করলেন, ওই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার ভট্টাচার্য। '৭১ সালে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, কিন্তু সব ঘটনা তাঁর মনে আছে। চুরকা ছিল তাঁরই স্কুলের ছাত্র। সেজন্য তাঁরা অর্থাৎ শিক্ষক-ছাত্র সকলে গর্ব অনুভব করেন। তবে, অসীমবাবু চুরকা-র স্মৃতি অমলিন রাখা ও প্রতিবছর অনুষ্ঠান পালন করার জন্য চুরকা মুর্মু স্মৃতিরক্ষা সমিতি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যতম বক্তা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত তাঁর ভাষণে বলেন, সমাজকে আপন করলে সমাজের জন্য কাজ করার এমনকী আত্মবলিদান করার মনোভাব গড়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে 'বাংলাদেশ' গঠনের ক্ষেত্রেও চুরকা-রও সৈনিকদের সমান শ্রেয় প্রাপ্য। চুরকা আমাদের আদর্শ, ভারতমাতার সুপুত্র। সমিতির আবেদনে স্কুলের নির্মীয়মান ছাত্রাবাস শহীদ চুরকা মুর্মুর নামে নামাঙ্কিত করার জন্য স্কুল পরিচালন সমিতিকে অনুরোধ করবেন বলে ঘোষণা করেন হেডমাস্টার মশায়। সকলে করতালি দিয়ে স্বাগত জানান। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্তগ্রাম চকরামপ্রসাদ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক চকরামপ্রসাদ শাখার মুখ্যশিক্ষক চুরকা মুর্মু ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট বি এস এফ জওয়ানদের সঙ্গে গ্রামরক্ষা করতে গিয়ে পাকিস্তানী সেনাদের গুলিতে নিহত হন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বালুরঘাট শহরে গঠিত হয়েছে অমর শহীদ বীর চুরকা মুর্মু স্মৃতিরক্ষা সমিতি। প্রতিবছরের মতো এবারও চুরকা মুর্মুর বলিদান দিবস সমিতির উদ্যোগে বালুরঘাট শহরের জয়চাঁদলাল প্রগতি বিদ্যাচক্র হাইস্কুলে পালিত হলো। বিদ্যালয়ের হলঘরে ১৮ আগস্ট দুপুরে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং সমিতির কর্মকর্তারা একত্রিত হয়েছিলেন। চুরকার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অদ্বৈতচরণ দত্ত, অসীম কুমার ভট্টাচার্য, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, ক্রীড়াভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সংযোজক মধুময় নাথ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকার প্রমুখ। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ও চুরকার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। চুরকার স্মৃতিতে উইলসন টুডু ও সনাতন হাঁসদাকে ৫০১ টাকা করে ছাত্রবৃত্তি সমিতির পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। শেষে ধন্যবাদ জানান সমিতির কর্মকর্তা রামচন্দ্র বসাক। চকরামপ্রসাদ গ্রামে এদিন চুরকার সমাধি ও শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক যোগেন মাহাতো, সহপ্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো, সুকেশ মণ্ডল এবং অন্য অনেকে। গ্রামের মাঠে গ্রামবাসীদের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় কাবাডি ও তীরন্দাজী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বড়াইল আশ্রমের মদন হাঁসদা, সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সহ-সম্পাদক বাসুদেব পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে চুরকা-র বৌদি, ভাইপো ও পরিবারের অন্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

তালিবানদের লক্ষ্য এবার চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকপন্থী জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা ভারত, আমেরিকাতেই শুধু নয়, খোদ জন্মদাতা পাকিস্তানকেও ছেড়ে কথা বলছে না। এবার তারা চীনেও হামলা চালাতে পারে বলে খবর। গত ৮ আগস্ট চীনের রাজধানী বেজিং থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা এখবর দিয়েছে। গ্লোবাল টাইমস্ লিখেছে— সন্ত্রাসবাদীদের মদত পেতেই চীনেও ব্যাপক এলাকা জুড়ে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে। তালিবানীরা মাথাচাড়া দিচ্ছে। প্রসঙ্গত, দু'বছর আগে চীনে উইগুর মুসলমানরা ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছিল। তাতে কুড়িজন লোক মারা যায়। পত্রিকাটি আরও লিখেছে— আমেরিকা একসময় তালিবানদের মদত দিয়েছিল। পাক মদতে ওই জেহাদিরা ভারত এবং খোদ পাকিস্তানে অনেক সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে সেই জেহাদিরা চীনের ঝিনজিয়াং এবং অন্যান্য এলাকায় জবরদস্ত হামলাও চালাতে পারে। আরও বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী তালিবানরা আফগানিস্তানকে তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করছে। আর পাক-সীমান্ত এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে। দৈনিকটি আরও লিখেছে— ২০০১-এ আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা করার পর তালিবানীরা পাক-আফগান সীমান্তের দুদিকেই ব্যবহার করেছে। পাকিস্তানকে জেহাদি তালিবানরা বিশ্রাম, সদস্য-ভর্তি এবং ষড়যন্ত্র করার কাজে ব্যবহার করত। এসব কাণ্ডকারখানাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পাকিস্তানের কোনও সদিচ্ছাই নেই। চীনও আমেরিকার মতোই পাক-আফগান সীমান্তের ডুরান্ড লাইনে কড়া নজর রাখছে। ডুরান্ড লাইন খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্বল।

হাওড়া স্টেশনে সঙ্ঘের সেবাকাজ।

উত্তর-পূর্বের আতঙ্কিত ট্রেনযাত্রীদের পাশে সঙ্ঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতে কর্মরত এবং পাঠরত উত্তরপূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যাপকহারে হুমকি ও এস এম এস-এ প্রাণনাশের হুমকি দেওয়াতে হাজারে হাজারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দারা প্রাণ হাতে নিয়ে ট্রেনপথে নিজরাজ্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। বলা হচ্ছে গুজব রটানো হয়েছে। একশজনের জায়গায় এক হাজার জন বিশেষ ট্রেনে রওনা হচ্ছে। এখবর শোনামাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এবং সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের কর্মীরা বাঙ্গালোর, খড়্গপুর, হাওড়া, মালদহ এবং শিলিগুলিতে ট্রেনে আরোহী উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসীদের খাবার ও পানীয় জল প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়— রেলের পক্ষ থেকে ন্যূনতম মানবিকতা দেখানো হয়নি। উপরন্তু হাওড়া ও শিলিগুড়িতে রেল পুলিশ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের এই সেবাকাজে রীতিমতো বাধা দেয় বলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা অভিযোগ করেছেন। মালদাতে বি এম এস, শিলিগুড়িতে— উত্তরবঙ্গ সেবাভারতী, কল্যাণ আশ্রম ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি ওমপ্রকাশজী এবং জগদীশ আগরওয়ালের নেতৃত্বে ১৭, ১৮, ১৯ তারিখেও বিভিন্ন ট্রেনে জল ও খাবার দেন। উৎফুল্ল হয়ে যাত্রীরাই ভারতমাতা কী জয় ধ্বনিতে সকলকে স্বাগত জানান। রেল পুলিশ 'ভারতমাতা কী জয়' বলতেও বাধা দেয়।

বার্ষিক গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আবেদন

ডাকযোগে যাঁরা স্বস্তিকা নেন, তাঁরা প্রতি কপির উপরে কাগজে লেখা গ্রাহক নম্বর এবং মেয়াদ শেষের তারিখ দেখে সেই অনুসারে মেয়াদ শেষের এক মাসের মধ্যে মনিঅর্ডার কিংবা অন্য উপায়ে পরবর্তী বছরের নবীকরণের জন্য গ্রাহক মূল্য পাঠিয়ে রসিদ সংগ্রহ করবেন। পুরনো গ্রাহকরা অবশ্যই গ্রাহক নম্বর লিখে পাঠাবেন। যদি কোনও কারণে নবীকরণ করা সম্ভব না হয় তাও সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে জানাবেন। নতুনদের ক্ষেত্রে পুরো নাম-ঠিকানা (পিন সহ) ও টাকা পাঠিয়ে রসিদ নেবেন।

যাঁরা এজেন্টদের মাধ্যমে স্বস্তিকা পেয়ে থাকেন, তাঁরা তাঁদের বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদের তারিখ এজেন্টের কাছে জেনে নিয়ে এক মাসের মধ্যে এজেন্টের মাধ্যমে নবীকরণের টাকা জমা করে তার মাধ্যমেই রসিদ সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে নবীকরণ সম্ভব না হলে এজেন্টদের মাধ্যমে কার্যালয়ে জানাবেন। পুনরায় যখন গ্রাহক মূল্য জমা দেবেন সেই সময় থেকে পত্রিকা আবার চালু করা হবে। এজেন্টের সঙ্গে সবদিক থেকে সহযোগিতা ও যোগাযোগ রাখতে পারলে ভালো। সর্বত্রই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। আপনার নিকটবর্তী এজেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য তার ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখা ভালো। উল্লেখ্য, স্বস্তিকা থেকে এজেন্টকে গ্রাহকদের তালিকা পাঠানো হয়ে থাকে।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

আইনি পথে ভারতে এসে ৫৮ হাজার বাংলাদেশী নিখোঁজ : সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সরকারিভাবে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, গত তিন বছরে আইনি পথে ভারতে এসেছেন এমন ৫৮ হাজার বাংলাদেশী নাগরিককে এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেসব বিদেশী ভারতে আসেন, তাদের মধ্যে শুধু বাংলাদেশীরাই তাদের ফিরে যাওয়ার সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও এদেশে থেকে যান। লোকসভায় সরকারের পেশ করা তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে ২০১১-র ডিসেম্বর— এই তিন বছরে কমপক্ষে ৮২ হাজার ৫৮৫ জন বাংলাদেশী স্বেচ্ছায় তাদের দেশে ফিরে যায়নি। যে সমস্ত বিদেশী ভারতে আসেন, তাদের মধ্যে ৩০ শতাংশই বাংলাদেশী যারা তাদের ভিসার নির্দিষ্ট সময়ের পরেও থেকে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আইনি পথে ভারতে এসেও যেসব দেশের নাগরিকরা আর ফিরে যাওয়ার নাম করেনি, সেই দেশগুলি হলো আফগানিস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, নাইজেরিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, চীন, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, ইয়েমেন, ওমান এবং মালয়েশিয়া।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় স্বাধীনতা দিবসেই জাতীয় পতাকা লাঞ্ছিত

সংবাদদাতা॥ গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিনই দক্ষিণ ২৪ পরগণার আমতলায় একদল দুষ্কৃতীর হাতে জাতীয় পতাকা লাঞ্ছিত হলো। নির্যাতিত হলো স্বাধীনতা দিবস পালনকারীরা। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমতলা থেকে কয়েকজন যুবক সাইকেল র‍্যালি করে মৈপীঠ পর্যন্ত যায়। ফেরার পথে বেলা দেড়টা নাগাদ দেউল গ্রামের সাধুরানী কাটা-তে তাদের রাস্তা আটকে একদল দুষ্কৃতী ধারালো ভোজালি, লোহার রড ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। 'ভারত মুর্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে দুষ্কৃতীরা তাদের প্রচণ্ড মারধর করে। কয়েকটি সাইকেল থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা খুলে নিয়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়ায় ও পতাকার উপর থুতু ফেলে। কয়েকটি সাইকেল ভেঙে দেয়। ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে তারা কটূক্তি করে। বন্দেমাতরম শুনলে নাকি 'গুনাহ্' (পাপ) হয়। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় কিছু লোকের সহযোগিতায় দুষ্কৃতীদের হাত থেকে তারা মুক্তি পায়।

বিষয়টি নিয়ে লিখিতভাবে দুষ্কৃতীদের নামসহ কুলটি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত দুষ্কৃতীরা হলো— (১) রফিক লস্কর (পিতা--- ছাদেক, সাকিন-গোপালগঞ্জ), (২) মহদুল লস্কর (পিতা--- বাবুরালী), ৩। আসার লস্কর (পিতা— ছাদেক), (৪) জয়লাল পুরকাইত (পিতা— অজ্ঞাত), (৫) সাহাবুদ্দিন লস্কর (পিতা--- অজ্ঞাত) সহ আরও অনেকে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় মাঝে মধ্যেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে আক্রান্তদের তরফে জানানো হয়েছে।

কেরল ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র হয়ে উঠছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভগবানের নিজের দেশ বলে খ্যাত কেরল এখন মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের কাজকর্মের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সী (এন আই এ) সূত্রে এই সংবাদ জানা যাচ্ছে। স্টুডেন্স ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি)-র মতো বেশ কয়েকটি নিষিদ্ধ মুসলিম সংগঠন বিভিন্ন নামে কেরলে তাদের কাজের জাল বিছিয়ে চলেছে। মুসলিম উগ্রপন্থীরা হাওলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কেরলে তাদের শিকড় ছড়াচ্ছে, বিশেষত উত্তর কেরলের কাসারগড়, কোঝিকোড়, কান্নুর ও মাল্লাপুরম-এর মতো জেলাগুলিতে। এমনকী রাজ্যের পুলিশ বিভাগেও তারা অনুপ্রবেশ করেছে বলে খবর। গত জানুয়ারিতে তিরুবনন্তপুরমের পুলিশ হেডকোয়ার্টারের গোয়েন্দা বিভাগের কিছু শ্রেণীবদ্ধ তথ্য ই-মেল-এর মাধ্যমে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় কেরলে যে মুসলিম উগ্রপন্থীরা বেশ সক্রিয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই গোপন তথ্য ফাঁস হওয়ার জন্য একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে চিহ্নিতও করা হয়েছে।

কেরলে যেসব কাজ করার পরিকল্পনা উগ্রপন্থীরা করেছে, সারা দেশে তা ছড়িয়ে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। কেরলে সরাসরি এসব ধ্বংসাত্মক কাজ তারা করতে চাইছে না। কেননা কেরলের সংবাদ মাধ্যমের নজরদারি খুব বেশি। তবে অদূর ভবিষ্যতে কেরলে যে তা করা হবে না এমন ভবিষ্যৎ বাণী ঠিক নয় বলে এন আই এ সূত্রটি জানিয়েছে।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির কারণে জিডিপি বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৮ আগস্ট দিল্লিতে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও দলীয় শীর্ষ নেতারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সারাদিন ব্যাপী বৈঠকের উদ্বোধন করে দলের সভাপতি নীতিন গডকরি বলেন, এন ডি এ শাসিত রাজ্যগুলি অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় ভাল কাজ করছে। তিনি বলেন দেশে এখন ৬ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি হচ্ছে। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ। তাই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির কারণেই জিডিপি বাড়ছে বলা যায়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আক্ষরিক অর্থেই 'লুঠ' করছে দেশের সম্পদ

গূঢ়পুরুষের কলম

দেশজুড়ে এ এক অদ্ভুত আঁধার ঘনিয়েছে। কেন্দ্রে টানা আট বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আক্ষরিকভাবেই দেশের সম্পদ লুঠ করেছে। এবং এখনও করে চলেছে। সংসদে কয়লা, বিদ্যুৎ এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের যে রিপোর্ট কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটার জেনারেল (ক্যাগ) জমা দিয়েছে তাতে স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করা হয়েছে, দুর্নীতির মাধ্যমে কমপক্ষে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। এর আগে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দফতরের মন্ত্রী-আমলা- সাংসদদের মাধ্যমে লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ করা হয় ক্যাগের রিপোর্টে। এই দুটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতির দায় বর্তায় প্রধানমন্ত্রীর উপর। তিনিই কেলেঙ্কারির খলনায়ক। কারণ, ক্যাগ রিপোর্ট অনুসারে, যে সময় কয়লা খাদানগুলি বেআইনিভাবে কয়েকটি বেসরকারি শিল্পসংস্থাকে দেওয়া হয় তখন কয়লা মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তাঁর সম্মতিতেই জলের দরে দেশের উৎকৃষ্ট কয়লার খাদানগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইন্ডিয়ার পরিবর্তে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়। ফলে, সরকারি রাজস্বের ক্ষতি হয় কমপক্ষে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবেই এই লেনদেনের একটা বড় অংশ ক্ষমতাসীন দালালদের পকেটে গেছে। তিহার জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী এ. রাজাও সাফাই দিয়েছিলেন, স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারীর দায় প্রধানমন্ত্রী এড়াতে পারেন না। কারণ, তাঁকে জানিয়ে এবং অনুমোদন নিয়েই জলের দরে কয়েকটি মোবাইল ফোন সংস্থাকে এই বিশেষ প্রযুক্তি পাইয়ে দেওয়া হয়। আর্থিক দুর্নীতির নায়ক হিসাবে তাই 'ক্লিন ইমেজ'-এর দাবিদার মনমোহন সিংকে চিহ্নিত করা যায়। সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে জবাবদিহি করতে হবে। অথবা পদত্যাগ করে আদালতে বিচার চাইতে হবে। তবে ঘটনার গতিপ্রবাহ যেদিকে বইছে তাতে মনে হয় না প্রধানমন্ত্রী সংসদে জবাবদিহি করবেন। কারণ, কংগ্রেস আর্থিক কেলেঙ্কারী ধামাচাপা দিতে ক্যাগ রিপোর্টটি সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠাচ্ছে। অর্থাৎ, বিষয়টি ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত ফাইলবন্দি থাকবে। যদি জনরোষে কংগ্রেস ও তার বন্ধু শরিক দলগুলি নির্বাচনে পরাস্ত হয় তবেই লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎকারীরা শাস্তি পাবে। নতুবা নয়। মনে রাখতে হবে এই ভয়ংকর আর্থিক কেলেঙ্কারীর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ। নির্বাচনের সময় ভোটাধিকার প্রয়োগ করে দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে দেশের নাগরিকদেরই। কারণ, শেষকথা সাধারণ মানুষই বলে। তাই বলছি, এ এক অদ্ভুত আঁধার ঘিরেছে দেশজুড়ে। গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্র চলছে সর্বত্র। মন্ত্রী আমলাদের আর্থিক দুর্নীতি, যৌন কেলেঙ্কারীর ঘটনায় কেউ চমকায় না। ধরেই নেওয়া হচ্ছে, ক্ষমতা থাকলে মন্ত্রী নেতারা এসব অপরাধ করবেই। কিন্তু এটা ভুল। দেশের মানুষই নির্বাচনের মাধ্যমে এইসব মন্ত্রী-নেতাদের শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছেন। তখন তাঁদের মনোনয়নে ভুল হয়েছিল। তাই পরবর্তী নির্বাচনে সেই ভাল সংশোধনের সুযোগ আছে। সেই সুযোগ হারালে সারাদেশ অন্ধকারে ডুবে যাবে। কেন্দ্রে মাত্র ৮ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সরকারি কোষাগারকে প্রায় শূন্য করে দিয়েছে কংগ্রেসের ইউপিএ জোট সরকার। এই জোটকে আরও সাত-আট বছর ক্ষমতায় থাকলে ভারতকেই বেচে দেবে বহুজাতিক শিল্পসংস্থার কাছে। এটা শুধু কথার কথা নয়। রূঢ় বাস্তব। কেন্দ্রে কংগ্রেসের ইউপিএ জোট সরকার কয়লা খনি বন্টন, বিদ্যুৎ প্রকল্পে অবৈধ কয়লা পাচার, দিল্লির বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের নামে বেসরকারি বড় বড় সংস্থাকে অবিশ্বাস্য ছাড় দিয়েছে। তাতে অভূতপূর্ব লোকসানের বোঝা বইতে হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষকেই। একটি উদাহরণ দিলেই অবিশ্বাস্য ছাড় দেওয়ার দুর্নীতিটি বোঝা যাবে। দিল্লীর নবনির্মিত বিমান বন্দর প্রকল্পের বরাত দেওয়া হয় বেসরকারি সংস্থা জি এম আর-কে। বাৎসরিক মাত্র ১০০ টাকায় বিশাল প্রকল্পের জমি ৬০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়। এই সংস্থা দু' বছরেই তাদের বিমানবন্দর ব্যবহারের জন্য যাত্রীদের কাছ থেকে ৩ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা 'ফি' আদায় করেছে। একে অবিশ্বাস্য সরকারি ছাড় ভিন্ন আর কী বলবো? এরপরেও আমাদের 'মিস্টার ক্লিন' প্রধানমন্ত্রী ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখে স্বাধীনতা দিবসে ভাষণ দিলেন। নানা উপদেশ দিলেন। কোথাও দেশবাসীকে ঠকানোর জন্য অনুতাপ করার চিহ্ন দেখা যায়নি। এরপরেও ভারতবাসী দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার জন্য 'মিস্টার ক্লিন'-কে ক্ষমা করবেন?

বার্ষিক ১০০ টাকায় বিশাল প্রকল্পের জমি ৬০ বছরের জন্য লিজ!

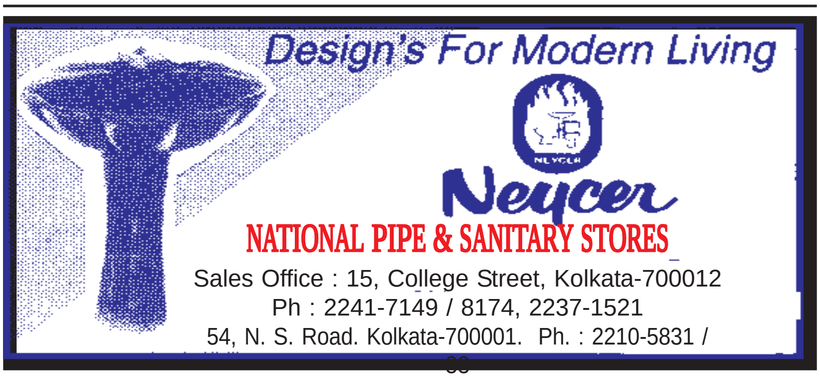

রাজ্য কি একদলীয় একনায়কতন্ত্রের পথে যাচ্ছে?

নিশাকর সোম

''ডোন্ট ফরগেট আই অ্যাম অলসো আ ল-ইয়ার''— দূরদর্শনে এই বক্তব্য শোনা গেল। বক্তা রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য-বিধানসভার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''টাকা দিয়ে আদালতের রায় কেনা যায়।'' যদিও মুখ্যমন্ত্রী পরে বলেছেন যে তিনি একথা বলেননি। বিধানসভার কার্যবিবরণী দেখলেই বোঝা যাবে। বিরোধীরা বলছেন, ''বিধানসভার কার্যবিবরণী কি বদল করা যায়?'' এ-প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তার গুরুত্ব ও ভয়াবহ পরিণামের কথা হয়তো তিনি ভাবেননি। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে এর আগে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অ্যাখ্যা দেননি।''

কে ঠিক? হাইকোর্ট না বিধানসভা? সোজা কথায়, কে বড়? কার ক্ষমতা বেশি? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশে একদিন বাদেই রাষ্ট্রপতি এই প্রশ্নের জবাবের জন্য সমগ্র বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে পাঠালেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যখন সিপিএম-নেতা বিমান বসু ও শ্যামল চক্রবর্তী বিচারকদের সম্বন্ধে কটূক্তি করেছিলেন তখন তৃণমূল নেত্রী কী বলেছিলেন!

বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, তিনি অর্থমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে আর্থিক সমস্যা সমাধানের কথা বলেন! জেলায় জেলায় সভা করে ডি এম-দের জনগণের সামনে তিনি হেনস্থা করেন। বস্তুত তিনি একাই সর্বেসর্বা। এটা কি স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্বের সূচনা?

সংস্কৃতে একটি কথা আছে— ''কীর্তি যস্য সঃজীবতি।'' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বহু ভালো কাজের নিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ মন্তব্য ও কাজ পদমর্যাদা অনুযায়ী হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে বিরোধী নেত্রীর আচরণ ফুটে উঠেছে নাকি? মুখ্যমন্ত্রীর বেলপাহাড়ি সভায় জনৈক কৃষক প্রশ্ন করেন, 'সারের দাম বেড়েছে, কৃষকরা বাঁচতে পারবেন না।'

খবরে প্রকাশ এই যুবকটি বারংবার চিৎকার করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে বাধা দিলে মুখ্যমন্ত্রী সভার মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন--- 'চার-পাঁচজন মাওবাদী গোলমাল করতে এসেছে। এই ছেলেটা মাওবাদী। একে গ্রেপ্তার করুন, আমি এদের চিনি— একজনকে ধরিয়ে দিলাম।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর পুলিশকর্তা গঙ্গেশ্বর সিং ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করেন এবং

রাজ্য রাজনীতি

পরে ছেড়ে দেওয়া হলেও আবার জামিন-অযোগ্য ধারায় আটক করা হয়।

এ সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মার্কণ্ডেয় কার্টজু বলেছেন, আমি এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি আমার মত পরিবর্তন করছি। আমি বিশ্বাস করি ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক নেত্রী হবার কোনও যোগ্যতা তাঁর নেই। কেননা নাগরিকদের সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকারের প্রতি তাঁর কোনও শ্রদ্ধা নেই। তিনি স্বৈরতন্ত্রী অসহিষ্ণু খামখেয়ালি।' তিনি আরও বলেছেন, 'বেলপাহাড়ির ঘটনায় মমতাকে আগেই গ্রেফতার করা উচিত ছিল।'

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে অনড়। তিনি গত বৃহস্পতিবার মহাকরণে বলেছেন— 'যা বলেছি আবার বলবো। আমি বিচারপতিদের চোর বলিনি।' (ঘুরিয়ে চোর বলা হলো নাকি?)

শিলাদিত্য চৌধুরীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেছেন— কৌশিক সেন ও সুনন্দ স্যানাল। এঁরা দু'জনেই মমতার পক্ষে ছিলেন। শিলাদিত্য চৌধুরী এক গরিব কৃষক। তিনি বলেছিলেন 'দিদি চাষিদের জন্য কিছু বলুন। সারের দাম বেড়েছে চাষ করতে পারছি না।' (মমতার জবাব সারের দাম বাড়ার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার।)

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সন্তোষ হেগড়ে বলেছেন— 'মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদার কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে ওই ধরনের কোনও মন্তব্য আশা করা যায় না। এই ধরনের মন্তব্য করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর।' প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল সোলি সোরাবজিও এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আদালতের রায় সম্পর্কে বক্তব্যকে নিন্দা করেছেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি কাজে মন্ত্রিসভার '২নং' সুব্রত মুখার্জি এবং ববি হাকিম সমর্থন করে চলেছে। পার্থ চ্যাটার্জিকে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পার্থ চ্যাটার্জিই বিধানসভার দলীয় নেতা।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, রবীন্দ্রতীর্থের জমি কার? ২০ কোটি ব্যয় করে এই রবীন্দ্রতীর্থ তৈরি হবে! পরাজিত মন্ত্রী গৌতম দেব হিডকোর কর্তা হিসাবে জোর করে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে এই জমি দখল করিয়েছিলেন। নারকেল বাগানের চাষিরা তখন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তৃণমূল তখন নারকেল বাগানের চাষিদের সমর্থনে ছিল, এখন কিন্তু তৃণমূল সরকার গৌতম দেবের কায়দায় এই জমি দখল করছে। হিডকোর এখন কর্তা হলেন ববি হাকিম।

সাধারণ মানুষ যখন ইলিশের ছবি দেখেই সন্তুষ্ট থাকছেন, তখন ১২০০ টাকা কেজি দরের (সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য) ইলিশ খাইয়ে তৃণমূলী বিধায়ক এবং মন্ত্রীরা ইলিশ উৎসব করলেন। রোম যখন পুড়ছিল তখন নীরো বেহালাতে সুর তুলেছিলেন! এই উৎসবে স্থানীয় বিধায়ক সাধন পাণ্ডে এবং তার গোষ্ঠীকে দূরে রাখা হয়।

এদিকে সিপিএমে বুদ্ধবাবুর হেনস্তা চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার পার্টির সংগঠকদের সভায় বুদ্ধবাবুর বক্তৃতার সময় পার্টির কর্মী-নেতারা বেরিয়ে যান। রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, 'বুদ্ধবাবুকে রোদে পুড়ে সাদা রঙ বদলে পার্টিকে সক্রিয় করতে হবে। বুদ্ধবাবুর কাছ থেকে চীনের কথা শুনবো কেন?'

তৃণমূল-সিপিএম উভয় দলেই নেতৃত্বের মধ্যে অহমিকা দানা বেঁধেছে। সিপিএম গণ-সংগঠনে নতুন নেতৃত্ব বসানোর মারফৎ পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে। কিন্তু রাজ্য-পার্টির নেতৃত্বের পরিবর্তন হলো না কেন? ▯

মাস্টারমশাই কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী একজন আদর্শ শিক্ষক ও সংগঠক

দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ‘Man Making Education’। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে কিছু আশ্রম বা মঠ-মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁর চিন্তাধারা কিছুটা রূপায়িত হলেও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। তার ফলে আজ ভারতবর্ষে আদর্শ মানুষের বড় অভাব। লোককল্যাণে, সমাজকল্যাণে, ছাত্রকল্যাণে ব্রতী চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক ক্রমশই যেন সমাজে কমে যাচ্ছে। এমনই এক অবক্ষয়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ছাত্রদরদী, সমাজসেবী, দেশপ্রেমিক, ত্যাগের মূর্ত প্রতীক আচার্য কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর কথা খুব মনে হয়। সমাজের আবাল-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র সকলের কাছেই তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়, একান্ত প্রিয় ‘মাস্টারমশাই’। আদর্শ শিক্ষাব্রতী, জ্ঞানী, কর্মযোগী, সহজ সরল আপনভোলা মানুষ কেশবচন্দ্র সত্যই ছিলেন সকলের মাস্টারমশাই। শিশু যুবক কিংবা বৃদ্ধ, উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক অথবা সাধারণ কর্মচারী, ধনী অথবা দরিদ্র যাঁরাই তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে একবার এসেছেন তাঁরা কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁর মহান জীবন থেকে।

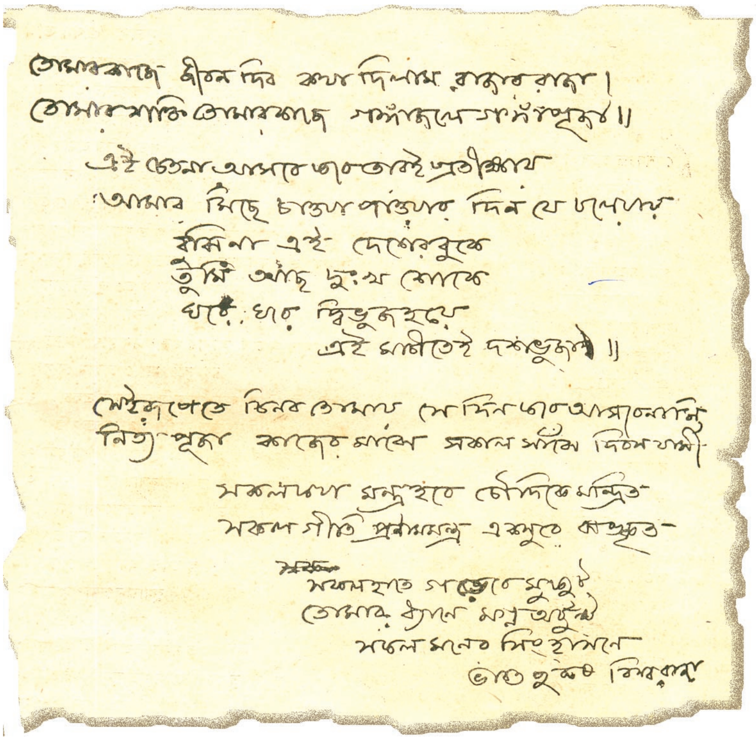
তোমার কাজে জীবন দিব কথা দিলাম রাজার রাজা।
তোমার শক্তি তোমার কাজ সার্থকে সার্থপূর্ণ॥
এই তো মোর আসরে আজ তোমারই প্রতীক্ষায়
আমার মিছে চাওয়া পাওয়ায় দিন যে চলে যায়
কাঁদি না এই দেশের বুকে
তুমি আছ দুঃখ শোকে
ঘরে ঘরে দ্বিভুজ হয়ে
এই মাটিতেই দশভুজা॥
সেই রূপেতে চিনব তোমায় সেদিন আজ আসবে জানি
নিত্য পূজা কাজের মাঝে সকাল সাঁঝে দিবস যামী
সকল কথা মন্ত্র হবে চৌদিকে মন্দ্রিত
সকল গীতি প্রণামমন্ত্র একসুরে ঝঙ্কৃত
সকল হাতে সংযোগে যুক্ত
তোমার ধ্যানে মগ্ন অটুট
সফল মনের সিংহাসনে
ভাস্বর রূপে বিরাজো

মাস্টার মশাইয়ের লেখা শেষ গান। ১৯৭৯-র জানুয়ারিতে এলাহাবাদে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার আগে এটি লেখেন। ফিরে আসার কয়েকদিন পরেই তিনি লোকান্তরিত হন।

মাস্টারমশাই-এর শিক্ষকতার জীবন শুরু হয় হাওড়া জেলার শিবপুর অঞ্চলের দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ) বিদ্যালয় থেকে। পরে নিজের প্রতিভা বলেই হাওড়া গার্লস কলেজের সহ অধ্যক্ষ এবং পরবর্তীকালে অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে পদেই তিনি ব্রতী থাকুন না কেন বাড়িতে তিনি নিয়মিত সামান্য দশটাকা মাইনেতে কোচিং ক্লাস চালাতেন। এই কোচিং ক্লাস তাঁর কাছে ছিল এক ‘সেবা প্রকল্প’। কারণ, অর্থটা তাঁর কাছে কোনওদিন বড় হয়ে দেখা দেয়নি। একঘর ছাত্র, বসার জায়গা নেই। অনেক সময় কোনও কোনও ছাত্রকে জানলাতেও বসতে হোত। হয়তো দু-মাস পড়ানো হয়ে গেছে, ছাত্ররা মাইনে দিয়েছে কিনা তাঁর মনে নেই। পড়াতে পড়াতে একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হ্যাঁরে! তোরা সব মাইনে দিচ্ছিস তো?’ একজন ছাত্র বলে উঠলো, ‘হ্যাঁ মাস্টারমশাই! মাইনে দিচ্ছি’। তিনি বললেন, ‘আচ্ছা ঠিক আছে’। আবার পড়াতে শুরু করলেন। আমরা ছাত্ররা জানতাম— কেউ কেউ মাইনে দিতে পারে না, আবার কেউ কেউ দেয়ও না। কিন্তু মাস্টারমশাই-এর সেবিষয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এই মনোভাব আজকের দিনের শিক্ষকদের মধ্যে খুবই বিরল। এখন হলো ‘ফেল কড়ি মাখো তেল’। এখন শোনা যায়— অগ্রিম টাকা দিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি চালু হয়েছে। পূর্বেই ‘পাঁচ হাজার, দশ হাজার’ টাকা দিয়ে দিতে হয়। অথবা একটি বিষয় ইংরাজি বা বাংলা পড়াবেন শিক্ষক সপ্তাহে একদিন। দিতে হবে মাসে পাঁচশো টাকা (এটা মফঃস্বল অঞ্চলের রেট!)। মাস্টারমশাই-এর বৈশিষ্ট্য ছিল— তিনি সব বিষয় পড়াতেন, বাংলা থেকে অঙ্ক-বিজ্ঞান এবং পড়াতেন রবিবার ছাড়া প্রতিদিন। অথচ তখনকার দিনে স্কুল বা কলেজের মাইনে ছিল খুবই সামান্য। বর্তমানে স্কুল কলেজের শিক্ষকদের মাইনে প্রচুর বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে অনেকের মধ্যে ক্লাসে ফাঁকি দেবার প্রবণতা এবং কোচিং ক্লাসের বাড়বাড়ন্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে এ এক বিরাট বিপর্যয়। মাস্টারমশাই-এর বিষয় ছিল সংস্কৃত। তিনি

পণ্ডিতবাড়ির ছেলে ছিলেন, তাই অঙ্ক ও বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও পড়তে হয়েছিল সংস্কৃত নিয়ে। তিনি সংস্কৃতে এম. এ. এবং টোলবিভাগের শিক্ষায় কাব্য, ব্যাকরণতীর্থ ছিলেন। এছাড়াও বহু বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য।

একবারের ঘটনা। মাস্টারমশাই চলেছেন বাজারে। একটি ছাত্র তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালো। ছাত্রটি বলল, মাস্টারমশাই, দুটো অঙ্ক পারছি না, একটু দেখিয়ে দিতে হবে। রাস্তার ধারেই তার বাড়ির রকে বসে গেলেন ছেলেটিকে অঙ্ক কষাতে। তাকে নানা রকম অঙ্ক করাতে, বোঝাতে অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হলো। বাড়ির লোকেরা চিন্তিত, বাজার করতে অ্যাতো সময় তো লাগার কথা নয়। মাস্টারমশাই যখন বাজার নিয়ে ফিরলেন, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আর একবারের কথা। হাওড়ার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পুরানো স্বয়ংসেবক, হাওড়া কোর্টের আইনজীবী) তখন ম্যাট্রিকুলেশনের (এখনকার মাধ্যমিক) ছাত্র। ফাইনাল পরীক্ষায় অঙ্ক পরীক্ষার পূর্ব দিনের ঘটনা। রাত্রে একান্তে অঙ্ক অভ্যাস করছেন কিন্তু শেষের দিকে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক কিছুতেই করতে পারছেন না। তখন ঘড়িতে বাজে রাত্রি একটা। শচীনদার কাছে শোনা ঘটনা। তিনি বই খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মাস্টারমশাই-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাড়িতে এসে জোরে কড়া নাড়তে লাগলেন। মাস্টারমশাই ওপরের জানলা দিয়ে দেখেন, শচীন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। নেমে এসে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন অবাক হয়ে— শচীন, কি ব্যাপার, অ্যাতো রাত্রে! শচীন তার সমস্যার কথা জানাল। মাস্টারমশাই সামান্যতমও বিরক্ত হলেন না। একবার বললেনও না যে, রাত্রে না এসে কাল সকালে তো আসতে পারতে প্রভৃতি।

জরুরি অবস্থার পর (১৯৭৫-৭৭) কলকাতায় মাননীয় বালাসাহেব দেওরসের (বাঁ দিকে প্রথম) নাগরিক সংবর্ধনা সভায় মাস্টার মশাই (বাঁ দিক থেকে তৃতীয়)।

তিনি হাসিমুখে শচীনকে ভেতরে ডাকলেন, বসে গেলেন অঙ্ক করাতে। নানা ধরনের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করিয়ে দিলেন পরীক্ষার উপযুক্ত করে। রাত্রি দুটো বাজলো শচীনের বাড়ি ফিরতে। এমনই ছিল মাস্টারমশাই-এর মধুর স্বভাব ও ছাত্রপ্রীতি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্বামীজীর মানুষ তৈরি করার উদ্দেশ্যে (Man Making Misson) নিয়েই আজ দীর্ঘ বছর ধরে ভারতের রাষ্ট্রজীবনে ও সমাজজীবনে কাজ করে চলেছে। বহু পুরোনো দিনের কথা। মাননীয় সাগরজী তখন হাওড়া জেলার প্রচারক ছিলেন। শিশু থেকে যুবক তথা প্রৌঢ় পর্যন্ত মানুষের মধ্যে নির্মল ব্যক্তিচরিত্র ও প্রখর রাষ্ট্রীয় চরিত্র নির্মাণের যে কাজ 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' করে চলেছে তা মাস্টারমশাইকে আকর্ষণ করে। সেই সময় তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং আজীবন একনিষ্ঠ সেবকের মতো দেশমাতৃকার সেবা করে গেছেন।

কলেজের তিনি তখন অধ্যক্ষ, কিন্তু সেই গুরুদায়িত্ব পালন করেও সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গে কাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রান্তীয় সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই ছিলেন সঙ্ঘের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সঙ্ঘচালক। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি সময় পেলেই পশ্চিমবঙ্গের শহর থেকে গ্রাম, পার্বত্য অঞ্চল থেকে বনাঞ্চল নিরলসভাবে পরিভ্রমণ করতেন। সেই সঙ্গে প্রচার করতেন শিশু থেকে বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে হিন্দুধর্মের মহান আদর্শ, জাতীয়তাবাদ এবং ব্যক্তিজীবন ও রাষ্ট্রীয়জীবন গঠনের কথা। তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে এসে সে সময় বহু মানুষই সঙ্ঘের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর শিক্ষকতার গণ্ডী কলেজ আর কোচিং ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি তখন জাতীয় শিক্ষকের ভূমিকায় নিযুক্ত। মাঝে মাঝে সঙ্ঘের নিবাসে (কার্যালয়) স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের জীবনচরিত আলোচনার ক্লাস নিতেন। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের এই দুই রাষ্ট্রপুরুষের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, অনুপ্রাণিত করা। আবার যুবকদের জাতীয়তাবাদে, রাষ্ট্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সপ্তাহে একদিন পূজনীয় গুরুজী শ্রী মাধবরাও সদাশিব রাও গোলওয়ালকরজীর ভাষণের সংকলন 'Bunch of thoughts' গ্রন্থ অবলম্বন করে নিয়মিত ক্লাস নিতেন। মাস্টারমশাই যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি ছিলেন সুবক্তা এবং অনুভবী পুরুষ। তারজন্য শিশু থেকে যুবক সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনতো।

সকলের মধ্যে দেশপ্রেম ও ধর্মচেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি গতানুগতিক সঙ্ঘকার্যের বাইরেও অনেক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন যা একান্তই তাঁর নিজের চিন্তাপ্রসূত ছিল। তার মধ্যে একটি হলো পারিবারিক বনভোজন। এটি তখন হোত শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের পরিবারের লোকজন ছাড়াও বাইরের অনেকেও যোগদান করতেন। সেখানে সঙ্ঘের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান ছাড়াও শিশু, কিশোর, যুবক এবং মায়েদের জন্যও দেশপ্রেমকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা হোত। মাস্টারমশাই সকলকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিজেও বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা সে এক নির্মল আনন্দের হাট বসে যেতো। সবশেষে থাকতো মাস্টারমশাই-এর সহজ সরল অথচ প্রেরণাদায়ক ভাষণ। আর দোলযাত্রার দিন তিনি শুধু স্বয়ংসেবকদের নয় আপামর জনসাধারণকে নিয়ে রাস্তায় নামতেন দোল খেলতে। মাস্টারমশাইকে রাস্তায় নামতে দেখে বহু মানুষ সমবেত হোত। বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে একটি স্থানে মিলিত হতেন। সেখানে চলতো সবাই মিলে ফুটকড়াই-মঠ খাওয়া। সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হোত যেন এক দিব্য আনন্দ। এই দোলযাত্রা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাস্টারমশাই লোকসংগ্রহ তথা লোকসংস্কারের কাজ সাবলীলভাবে করে যেতেন।

শিক্ষক হিসেবে অথবা সংগঠক হিসেবে মাস্টারমশাই-এর ছিল গভীর প্রেম, আন্তরিকতা ও সমাজচেতনা। এর প্রধান কারণ মনে হয়, শ্রীভগবান ও দেশমাতৃকার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাব। নিজের লেখা গানের মধ্যে তাঁর প্রতিজ্ঞা-বাক্য তিনি পালন করে গেছেন অক্ষরে অক্ষরে— 'তোমার কাজে জীবন দিব কথা দিলাম রাজার রাজা'। ▯

স্মৃতির স্বর্ণরেখায়

কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতি

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে শিবপুর দীনবন্ধু কলেজে প্রবেশমাত্রে যাঁদের সানন্দ অভ্যর্থনা লাভ করেছিলুম, তাঁদের একজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী। এখনো যেন তাঁর সেই চেহারা দেখতে পাই : টকটকে ফর্সা রঙ, ঈষৎ সোনালি চুল, খোঁচাখোঁচা দাড়ি (নিয়মিত দাড়ি কামানোর বিলাসকে অবশ্যই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না!), নস্যি-লাগা নাক, নস্যিতে ঝুল-কালো ন্যাকড়ায় নাক পরিষ্কারের চেষ্টা, স্থূল চতুষ্কোণ চেহারা, ঢোলা পাঞ্জাবি, যা হাঁটুর নীচে নেমেছে, খসে-খসে পড়ছে ধুতি, তাকে কোমরে ধরে রাখার চেষ্টায় তা সামনের দিকে হাঁটুর উপরে উঠে গেছে, কিন্তু পিছনের কাছা মাটিতে লুটোচ্ছে, মুখভরা শিশু-হাসি আর চোখে আশ্চর্য দীপ্তি।

আরও সাতাশ বছর পরে তাঁকে একদিন কলেজ স্ট্রীটে দেখলুম, সেই শেষ দেখা, বাস ধরার চেষ্টা করছিলেন, তাতে ব্যর্থ এবং উদ্‌ভ্রান্ত, চেহারা প্রায় একই রকম আছে, কেবল চুলের রঙ সোনালি নয়, একেবারে সাদা, আর চোখে উজ্জ্বলতার বদলে গভীর অন্তর্মগ্নতা। বয়সের জন্যই কেশের শুভ্রতা, একই কারণে হয়ত চোখের গভীরতা। কিন্তু মনে হয়েছিল, শেষোক্ত পরিবর্তনের জন্য কারণও আছে। ইতিমধ্যে তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক একটি নির্দিষ্ট মতে বিশ্বাসী হয়ে তারই সংগঠনের নেতৃত্ব করছেন পশ্চিমবঙ্গে— তার মূল্য দিতে জরুরী আইনের সময়ে কারাবাস করেছেন। আমি ভেবেছিলাম--- এই মানুষটি জীবনকে গভীরভাবে নিয়েছেন— কারাগারের অন্তরালে ইনি নিশ্চয় জীবন ও জগতের রহস্যের ধ্যানে নিমজ্জিত ছিলেন— তারই অতল প্রশান্তির ছায়া ওই দুই নয়নে।

কেশববাবুকে আমি অনেক বছর ধরে দেখেছি। শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের মতো হাওড়া গার্লস কলেজেও তাঁর সহকর্মী ছিলাম। শেষোক্ত কলেজে তিনি প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। আমি ছেড়ে আসার সময়ে অবশ্য তিনি ভাইস প্রিন্সিপাল— শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য তখন প্রিন্সিপাল। কেশববাবু কলেজের প্রশাসনিক ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন, কিন্তু সর্বদাই মনে হোত, এসব যেন তাঁর নিজের কাজ নয়— তাঁর মন অন্য কোথাও পড়ে আছে, যার সবটার হিসেব আমরা পাচ্ছি না। তা হলেও আমাদের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক রাখতে তাঁর অসুবিধা হোত না। আমরা পুরনো সহকর্মী, ঠাট্টা-তামাশা খুবই হোত। গার্লস কলেজে তখন বিদগ্ধ মজলিশী আড্ডা জমত। যেখানে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ ভারতী, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্তী, অজিত ঘোষ প্রমুখের মতো বিখ্যাত অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ছিলেন, সেখানে জমকালো আড্ডা স্বতঃসিদ্ধ। ঐসময়ে কেশববাবুর সঙ্গে, তাঁকে নিয়েও নানারকম ঠাট্টা-তামাশা হোত। তাঁর কাছা-কোঁচার অসংলগ্নতা, কিংবা কলেজ-জীবনে তাঁর পক্ষে রোমান্টিক হওয়া সম্ভব ছিল কিনা— এই সকলই আমাদের কৌতুক ও কৌতূহলের লক্ষ্য ছিল। আমরা কম আমোদিত ছিলুম না খেলার মাঠে তাঁর

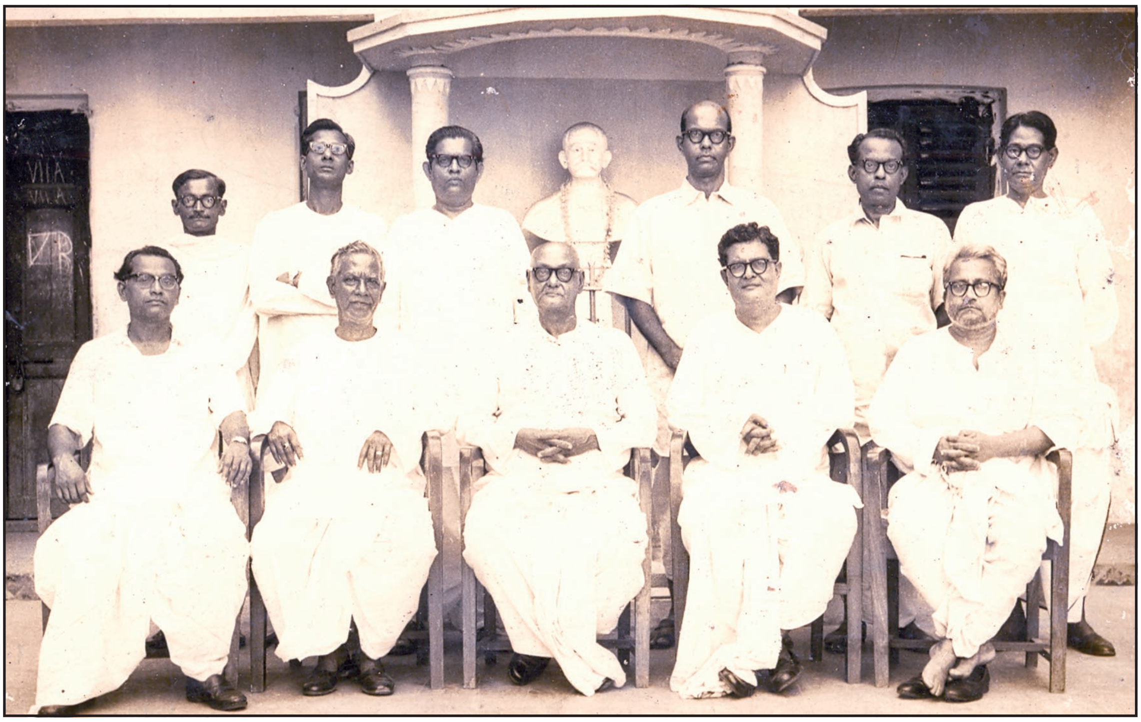

শিবপুর দীনবন্ধু স্কুলের পরিচালক মণ্ডলী। একদম ডানদিকে বসে কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী।

বীরকার্য সম্বন্ধে। দুধওয়ালা পার্কে তখন দীনবন্ধু কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদের বাৎসরিক ফুটবল, ক্রিকেট খেলা হোত, কেশববাবু ঐসব খেলায় উৎসাহে অংশ নিতেন। ক্রিকেট খেলার সময়ে তিনি ব্যাট ধরতেন মোষবলির খাঁড়ার মতো করে। ফুটবল খেলার সময়ে মুক্তকচ্ছে অসম্ভব বেগে ছুটতেন, যা দেখে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যছত্র স্মরণ করতাম— "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।" এখনো মনে পড়ে— ছেলেরা গোলের সামনে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে— আর কেশববাবু প্যাটন ট্যাঙ্কের মতো দুর্বার গতিতে ছাত্র, বল এবং নিজেকে নিয়ে গোলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন!

খেলার আর একটি ছবি মনে ভেসে উঠছে। একবার বিজয়বাবু তাঁর কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নিয়ে পিকনিকের ব্যবস্থা করেছেন (জায়গাটা কোথায়, মনে পড়ছে না)--- সেখানে ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থাও হয়েছে। টসে জিতে বিজয়বাবু প্রথমেই ব্যাট ধরেছেন, কেশববাবু তাঁর জুটি। উইকেটের দুই প্রান্তে এইরকম সুবৃহৎ উপস্থিতি কদাচিৎ দেখা যায়। বিশাল উন্নত পুরুষ বিজয়বাবু, অসীম শক্তিতে বহন করছেন পরিস্ফীত বস্তার মতো উদরকে, তারই নীচে কুণ্ঠিত ক্ষুদ্র একটি ব্যাট, যার হ্যান্ডেলের উপরিভাগ মাত্র তিনি ছুঁয়ে আছেন। উল্টোপ্রান্তে কেশববাবু প্রস্তুত, তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও এনার্জি নিয়ে, প্রিন্সিপালের দৌড়ে সাহায্য করবেন, আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষমান বিজয়কৃষ্ণের ভাবী সেঞ্চুরীর জন্য, বল করছেন এক তরুণ অধ্যাপক, এখনো যাঁর চাকুরি স্থায়ী হয়নি। তিনি প্রিন্সিপালকে গ্রেট ব্যাটসম্যান হয়ে ওঠার সর্ববিধ সুযোগদানে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ, সুতরাং আলতো হাতে একটি বল ছুঁড়লেন, সেই প্রথম বল, তার আগেই বিজয়বাবু আঁকাবাঁকা হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিয়েছেন একটা মহৎ কিছু করবেন বলে, কিন্তু কি দুর্দৈব, মাঠের দোষেই নিশ্চয়, বলটা হঠাৎ বেঁকে, বিজয়বাবুকে অবিচলিত রেখেই উইকেটকে বিচলিত করে, বেরিয়ে গেল। মাঠে মৃত্যুর স্তব্ধতা। কেশববাবুর মুখ দেখবার মতো। তাতে আতঙ্ক ও আশ্বাস দুইই। আতঙ্ক— ছেলেটির অবিমৃষ্যকারিতায়; আশ্বাস— না, না, ভয় নেই, তোমার চাকরি যাবে না। এমন সময়ে দেখা গেল মেঘ ভাঙা রোদ। বিজয়বাবু হাসলেন। সবাই হাসল। মৃতের পুনরুজ্জীবনের হাসি ফুটল তরুণ অধ্যাপকটির মুখে। দুটি কারণে কেশববাবুকে আমি কিছু বেশি নৈকট্যে পেয়েছিলুম। গার্লস কলেজে পড়াবার সময়ে আমি 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' বইটি লেখায় ব্যাপৃত ছিলুম। বিদ্যাপতির সাহিত্যের ভিত্তিতে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাব ও রূপের ঐতিহ্য কতখানি বর্তমান ছিল সে সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে সংস্কৃতের কিছু বই বিশেষতঃ কালিদাসের লেখাগুলি নিজের মতো করে বুঝতে চেষ্টা করছিলুম। সংস্কৃত টীকাকারদের অনুসরণে নয়— সরাসরি ওই সাহিত্য বুঝব একালের মন নিয়ে— এই ছিল অভিপ্রায়। তাই বলে উৎকেন্দ্রিকতার উৎসাহী ছিলুম না। অর্থাৎ ইচ্ছা ছিল— আগে কী বলা হয়েছে জেনে নিয়ে, কখনো তাকে মেনে নিয়ে, কখনো বা না-মেনে, কতখানি এগোনা যায়— তারই চেষ্টা করা। এই কাজ করার সময়ে আমি মাঝে মাঝে সংস্কৃতের অধ্যাপক কেশববাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছি। সে সময়ে দেখেছি— এই ধরনের আলোচনায় তিনি কতই না আনন্দিত! বুঝতে পারতুম— এটাই তাঁর কাজ— অথচ এসব কাজে পুরো মন দিতে পারছেন না, সেজন্য গভীরভাবে বিষণ্ণ। সবচেয়ে চমকিত হয়েছিলুম তাঁর বুদ্ধির সতেজ বৈজ্ঞানিকতা দেখে। তিনি একেবারেই পুরনোর মধ্যে অন্ধভাবে ঘুরপাক-খাওয়া পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি অবশ্যই নিমগ্ন ছিলেন ভারত-রসের মধ্যে— কিন্তু সানন্দ অবগাহন তাঁর— সরোবরে অর্ধনিমজ্জিত থেকে ঊর্ধ্বের সূর্যবন্দনা এবং তারপরে শুচিদেহে প্রতিদিনের জীবন পথে যাত্রা। বুদ্ধির আধুনিকতা বা বৈজ্ঞানিকতা কি করে এই সংস্কৃত অধ্যাপকের মধ্যে এই আকারে বর্তমান ছিল, তার উত্তর পেয়েছিলুম এক সহকর্মীর কাছে— কেশববাবু গণিতেও দক্ষ— তার থেকেই ওই ক্ষমতা এসেছে। ব্যাখ্যাটা আমার কাছে সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত মনে হয়নি। গণিতের অজস্র মস্ত-মস্ত পণ্ডিতকে পাওয়া যাবে যাঁরা গণিতের জগতের বাইরে নিতান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের অধিবাসী।

বস্তুতঃ কেশববাবুকে আমি বুঝতে চেয়েছিলুম এই দিক থেকেই। সচেতন যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়েই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করেছেন। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির মর্মসত্যের সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন। এদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে তিনি গর্বিত ছিলেন, অকারণ গর্ব নয় তা, কারণ ওই সভ্যতার অন্যতম আধার সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত হিসাবে জেনেছিলেন— ভারতবর্ষ সত্যই কী ছিল। তিনি নিজেকে কুলীন মনে করতেন। পিতৃপরিচয়হীন মৌলিকতাকে তিনি গৌরবজনক মনে করেননি। আবার একথাও জানতেন— বিদ্যাসাগর-পুত্ররা অবহেলার উচ্ছৃঙ্খলতায় বিদ্যার পচা ডোবা হয়ে দাঁড়ায়। যখন তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার, ভারত-সংস্কৃতির বিস্তারের ব্রত নিয়েছিলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল--- এই দেশে বিদ্যাসাগর-পুত্রদের 'পিতার পুত্র' করে তোলা।

আর একটি ক্ষেত্রে আমি মানসিকভাবে কেশববাবুর কাছাকাছি এসেছিলুম। আমরা দুজনেই স্বামী বিবেকানন্দকে একালে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির উদ্ধারক মনে করেছি। স্বামীজী কিভাবে তাঁর উপলব্ধিকে যজ্ঞাগ্নি করে তুলে, ভারত ও বিশ্বে তারই স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে, চিত্তের আলোকোৎসব সম্ভব করেছিলেন— তার দিব্যকাহিনীতে আমরা আসক্ত ছিলুম। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের কোন্ ভূমিকাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদও হোত। আমার অধিক জোর ছিল— স্বামীজীর ভগীরথ-ভূমিকার দিকে, যিনি 'আগে যান শঙ্খ বাজাইয়ে'। আর কেশববাবু জোর দিতেন স্বামীজী'র নব শঙ্করাচার্য ভূমিকার দিকে— যিনি ধারক, সংরক্ষক। কিন্তু আমাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না একটি ব্যাপারে— বিবেকানন্দই ভারত-পুরুষ। কেশববাবুর সঙ্গে আমার যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে। সেখানেই তা সমাপ্ত। এই ক্ষেত্রটিতে তাঁকে জ্ঞানমগ্ন, বলা উচিত, জ্ঞান-ধ্যান-মগ্ন-মানুষ হিসাবে দেখছি, যিনি নিজের স্বার্থে উদাসীন, অপরের সুখে আকাঙ্ক্ষী, প্রসন্ন নির্মল আনন্দময়। দৈনন্দিনের কর্দমাক্ত পথে এমন মানুষ বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় না। তাই এঁদের স্মৃতি আমাদের কাছে পুণ্যপ্রদীপের তুল্য। ▯

(লেখক স্বনামধন্য বিবেকানন্দ-নিবেদিতা গবেষক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। লেখাটি পুনর্মুদ্রিত।)

সোনালী অতীতের স্মৃতি

অমলিন স্মৃতি যেথা

ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ

১৯৭২-এ ঢাকায় পুনর্বাসনের কাজে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সভায় বক্তব্যরত সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক বর্তমানে প্রয়াত বংশীলাল সোনী।

১৯৭২ সাল। কলকাতার বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির পরিচালনায় সদ্য-মুক্তি- পাওয়া বাংলাদেশের রাজশাহী ও ঢাকা জেলার কয়েকটি কেন্দ্রে পুনর্বাসনের কাজ চলছে। তুলে দেওয়া হচ্ছে ছিন্নমূল মানুষদের হাতে তাঁদের জীবিকা অর্জনের সামগ্রী— শাঁখারীদের শাঁখ, তাঁতিদের তাঁত। সমিতির সভাপতিরূপে মাস্টারমশাইও (কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী) গেছেন বাংলাদেশে। তাঁর সঙ্গী আমি, নরেশদা (নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, তৎকালীন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সভাপতি) এবং বংশীদা (বংশীলাল সোনী, তখন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ বিভাগ প্রচারক)। এর আগেও বহুবার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে থাকার সুযোগ আমার ঘটেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কয়েকদিনের পরিবেশে তাঁর যে এক স্নিগ্ধ রূপের দর্শন পেয়েছিলাম, সেরূপ ছিল অনন্য সুন্দর।

তেইশ জুন ঢাকায় সমিতির পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রীর প্রথম দফার দানপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ-এর ত্রাণমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। দেবেন মাস্টারমশাই। আগের দিন বংশীদা আর আমি মালদহ থেকে জিপে করে মহদীপুর সীমান্ত দিয়ে নবাবগঞ্জ হয়ে ঢাকায় পৌঁছলাম। উঠলাম বুড়ী-গঙ্গার তীরে হোটেল মিনার্ভায়। বংশীদার সঙ্গে বিকালে গেলাম ঢাকা এয়ারপোর্টে। কলকাতা থেকে প্লেনে করে আসছেন মাস্টারমশাই এবং নরেশদা। বিরাট আন্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্র। এসে পড়ল বিমান। দূর থেকে দেখেই চিনতে পারলাম, নেমে আসছেন মাস্টারমশাই। হাঁটুর ব্যথার জন্য খোঁড়াতে হচ্ছে তাঁকে। দূর থেকেই দেখলাম বিমান থেকে নেমেই প্রণাম করলেন ভূমিকে। এ জন্মভূমির বিচ্ছিন্ন অংশ, কত মধুমাখা স্মৃতি উথলে উঠছে এর পবিত্র স্পর্শে।

জিপে করে ফিরলাম মিনার্ভা হোটেল। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন শ্রীরূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। যিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। মিনার্ভা একটা সাধারণ হোটেল। কিন্তু তার প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল সুন্দর, একপাশে বুড়িগঙ্গা আর সামনে ছিল ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ'র পুরনো প্রাসাদ।

পরের দিনে কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিয়ে এলাম মহঃ আবদুস সামাদ আজাদের বাসগৃহে। তিনি তখন বাংলাদেশ সরকারের বিদেশমন্ত্রী। রূপেনবাবুই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে। আলাপ আলোচনা সাধারণভাবেই হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম মাস্টারমশায়ের জ্ঞানের পরিধি এবং সরলতা মন্ত্রী মহোদয়ের হৃদয় জয় করে নিল। অপূর্ব এক শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভাবে তিনি মাস্টারমশায়ের কথা শুনছিলেন। আলোচনার পরিবেশে আমি হঠাৎ এক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসেছিলাম বাংলাদেশকে ইস্রায়েলের স্বীকৃতি নিয়ে। আলোচনা আমার প্রশ্নে কিছুক্ষণ থেমে গেল। আমিও খানিকটা বিব্রত বোধ করলাম। সাংবাদিকসুলভ আচরণ হয়ে গেল বোধহয়। ঘরোয়া পরিবেশকে আমি বোধ হয় ভেঙ্গে দিলাম। কিন্তু আজাদ মশাই আন্তরিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আজও মলিন হয়নি।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন শ্রী আবদুল হান্নান চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে মালদহে 'সৈনিক অভ্যর্থনা কেন্দ্র' চালাবার সময় পরিচয় হয়েছিল। ফলে ঘরোয়া পরিবেশ যে আরও আন্তরিকতাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তারই পরিচয় পেলাম— আবদুস সামাদ আজাদ এক সময় উঠে ভেতরে গেলেন। দেখলাম চা ও খাবার নিয়ে তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। আন্তরিকভাবে তিনি নিজে পরিবেশন করলেন সবাইকে। মাস্টারমশাইকে জানালেন সশ্রদ্ধ নমস্কার। যে মানুষটির ব্যক্তিত্বে আন্তরিকতায় ও জ্ঞানে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রী-গৃহে সেদিন আত্মীয়তার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তিনি আমাদের মাস্টারমশাই।

সেই পরিবেশ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। জিপে উঠতেই বংশীদা ও নরেশদার তিরস্কার পেলাম। জানতাম এটা আমার ভাগ্যে ঘটবেই। কারণ ইস্রায়েলের স্বীকৃতি প্রসঙ্গ তোলা। মাস্টারমশাই তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন ''বংশী, তোমাদের মনেও কি ওই প্রশ্নের উত্তর জানার আগ্রহ ছিল না?'' জিপে উঠতে উঠতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ''ঘরোয়া পরিবেশে প্রশ্ন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসে— প্রশ্ন করতে নেই।'' আজও ভুলিনি সে কথা।

সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম রমনার ময়দান। রমনা কালীবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের পাশে এসে দাঁড়ালাম। বিরাট উঁচু কালী-মন্দির

খান-সেনারা ধ্বংস করে দিয়েছে। ইঁটের স্তূপ। চারিদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। পরিবেশ যেন কেমন ম্রিয়মান করে দিচ্ছিল। সবার মুখেই স্তব্ধতার ছাপ। মাস্টারমশায়ের মুখের দিকে তাকালাম। অশ্রুসিক্ত নয়নে কেমন এক দৃঢ়তার ছাপ। শুধু একটি কথা বলতে শুনলাম— ‘‘মায়ের এ মন্দির কি আর উঠবে না?’’ তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রাত পেরিয়ে এল ২৩ জুন। দুপুর এগারটায় কার্যসূচী স্থির করা হয়েছে। মহঃ কামরুজ্জামান-এর কাছে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির পক্ষ হতে সমস্ত ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। মহঃ কামরুজ্জামান তখন বাংলা দেশ সরকারের ত্রাণমন্ত্রী। সকালবেলা হাতে কিছুটা সময় ছিল। রূপেনবাবু বললেন— ‘‘ফণীদার সঙ্গে দেখাটা এই সময় সেরে নিলে হয়।’’ ‘ফণীদা’ বলতে বাংলাদেশের প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় শ্রীফণীভূষণ মজুমদার। খুব সম্ভবত তিনি তখন খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী। গেলাম সেখানে। বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বারান্দার করিডরে সেই সময় দর্শনার্থীর প্রচণ্ড ভীড়। আমরা ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। ফণীবাবু এলেন। মাস্টারমশাইকে প্রাণভরা সম্ভাষণ জানালেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা। বুঝলাম দপ্তরে তাঁর কাজের ভীষণ চাপ। আমরা উঠতেই তিনি নমস্কার জানিয়ে মাস্টারমশায়ের হাত দু’টো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন ‘‘কেশববাবু, আমার এই হাত আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এগিয়ে দিলাম। নিশ্চিত বঞ্চিত হবো না।’’ আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একজন মন্ত্রীর কি আকুলতা! মাস্টারমশাই বললেন, ‘‘বলুন, এতো আমার সৌভাগ্য।’’ ফণীবাবু বললেন ‘‘সাহায্যপ্রার্থী সাহায্যকারীর বাড়ী গিয়ে সাহায্য চাইবে। আমার এই চেম্বারে নয়। আপনি কোথায় উঠেছেন বলুন আমি সেখানে আসব।’’ ছোট্ট একটা প্রত্যুত্তর ভেসে এল ‘হোটেল মিনার্ভা’। তিনি সেক্রেটারীকে নোট করতে বললেন। সেক্রেটারী অবশ্য এই ধরনের ছোট হোটেলের অবস্থান জানতেন না। আমরা ঠিকানা ও পথনির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। বারান্দার দরজা অবধি ফণীবাবু মাস্টারমশাইকে এগিয়ে দিলেন। দুপুর এগারটার আগে পৌঁছতে হবে ‘নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং’-এ।

সেক্রেটারিয়েটের লিফট ধরে এসে পৌঁছালাম মহঃ কামরুজ্জামানের চেম্বারে। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। ভারতবর্ষকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন যে সব মন্ত্রী ইনি তাদেরই একজন। মহঃ কামারুজ্জামানের সেক্রেটারী মুহূর্তেই অনুষ্ঠানের সব বন্দোবস্ত করলেন। বাংলাদেশ সংবাদ সরবরাহ সংস্থা (বা. স. স.) রিপোর্টাররা উপস্থিত ছিলেন। বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সভাপতিরূপে মাস্টারমশাই তুলে দিলেন সকল ত্রাণ সামগ্রীর দানপত্র। এতে ছিল তাঁত, (চিত্তরঞ্জন ও ঠকঠকি), জালের সূতা, কাঠি, বড়শি, ঔষধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সেই সময় মন্ত্রী মহোদয়ের ঘরে উপস্থিত ছিলেন কৃষক লীগের সভাপতি। তিনিও মাস্টারমশায়ের কাছে এসে এই দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। মাস্টারমশাই ও মন্ত্রী মহোদয় দু’চার কথা বললেন। অনুষ্ঠান শেষ। সাংবাদিকরা চলে গেলেন। কর্মব্যস্ত মন্ত্রী মহোদয়ের চেম্বারে মাস্টারমশায়ের সান্নিধ্যে স্বল্পমুহূর্তেই গড়ে উঠলো আন্তরিকতার পরিবেশ। আজও মনে পড়ে সেই প্রয়াত মন্ত্রীর কথা— যে দানে কোনও উদ্দেশ্য থাকে না সেই দানই মহৎ, যে দান স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেওয়া হয় তাতে থাকে পাপের স্পর্শ। মাস্টারমশায়ের হাত ধরে মন্ত্রী মহোদয়কে দেখলাম কৃতজ্ঞতা জানাতে। তিনি তাঁর গণ্ডী পেরিয়ে বললেন, আপনাদের মতো মানুষ আজও আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান বলেই তো আমরা আপনাদের শ্রদ্ধা করি। তাঁকেও দেখলাম দরজা অবধি মাস্টারমশাইকে এগিয়ে দিতে। আজ মনে প্রশ্ন জাগে সব মন্ত্রীই কি তাঁদের অতিথিদের দরজা অবধি এগিয়ে দেন? বোধহয়, না। এর জন্য চাই প্রাণের স্পর্শ। আত্মীয়তার অনুভূতি না জাগলে শুধু সৌজন্যবোধের স্পর্শ তো এ নয়। কোন্ এমন ব্যক্তিত্ব বিদেশী মন্ত্রীদের আচরণে আত্মীয়তার স্পর্শ জাগিয়ে তুলেছিল? এ শুধু ব্যক্তিত্বই নয়— এ যে সরলতা, সে সরলতার নাম মাস্টারমশাই। অনুষ্ঠান শেষ। মোটামুটি কার্যরূপায়ণের পদ্ধতিও শেষ। হাতে সময় আছে। মনে ভাবছি, ঢাকা শহর একবার দেখে নিলে হয় না। বংশীদা বলেছেন প্রেস ক্লাব থেকে সোজা হোটেলে ফিরবেন। মাস্টারমশাইকে বলতে যাচ্ছিলাম, ‘‘মাস্টারমশাই— হাতে তো সময় আছে একবার...’’ কথা শেষ করতে দিলেন না, বলে উঠলেন, ‘‘চল শহরটা একবার দেখে নিই।’’ আমার দেখার আগ্রহের সঙ্গে তাঁর আকুতির অনুভূতি ছিল একই রকম। সব কিছুতেই শিশু সুলভ কৌতূহল। অথচ এই মানুষই আবার তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে আমাদের সামনে একদিন বলেছেন, ‘‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নয়— ঐক্যের মধ্যেই বৈচিত্র্য--- ভারতের মূল কথা।’’ পাণ্ডিত্যের কি গভীর ব্যাপ্তি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এলাম ভাষা আন্দোলনের শহীদ বেদীতে। তখনও ভগ্ন শহীদ বেদী মেরামত হয়নি। এ শহীদ বেদীর ছবি দেখেছিলাম বাংলাদেশের মুক্তি প্রাপ্ত ছায়াছবি ‘‘জীবন থেকে নেওয়া’’তে। বেদীর সামনে নামলেন মাস্টারমশাই। লোক দেখানো শ্রদ্ধা নয় স্বাভাবিক শ্রদ্ধা দেখালেন সেই ২১ ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে।

দ্রুতগতিতে শহরের পথ অতিক্রম করে এলাম ঢাকেশ্বরীর মন্দিরে। এক অজানা পুলকে ও ভক্তিতে গায়ে শিহরন দিচ্ছিল। সাধারণ প্রাচীন মন্দির। ঢাকেশ্বরী স্বর্ণ নির্মিত দুর্গা দেবীর মূর্তি। মুক্তি যুদ্ধের সময় গুজব রটেছিল ঢাকেশ্বরী মূর্তি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই সব কাহিনী মিথ্যা— বললেন মন্দিরের একনিষ্ঠ পূজারী শ্রী জনার্দন চক্রবর্তী। মন্দিরের অলিন্দে মাস্টারমশাই ভক্তিতে লুটিয়ে পড়লেন। কেমন স্নিগ্ধসুন্দর পরিবেশ। পুজো দিলাম। পুরুতমশাই শোনালেন ঢাকেশ্বরী মন্দির খাঁন সৈন্যদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী। ঢাকী এগিয়ে এসে বললেন ‘‘বাবু, ঢাক বাজাই।’’ ঢাকের শব্দে কেঁপে উঠল মন্দির। এক অজানা শিহরন জেগে উঠল বংশীদার মুখে। তাঁকে দেখলাম যূপকাষ্ঠের মাটি নিয়ে কাগজে মুড়ছেন। তিনি বললেন— সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞা নেওয়ার সময় এ মাটি স্বয়ংসেবকদের কপালে লাগিয়ে বলব দেশজননীর খণ্ডিত রূপের মর্ম বেদনা অনুভব করতে শেখ। মাস্টারমশায়ের দিকে তাকালাম। অবিচল ভক্তিতে মাতৃমূর্তির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। এ আরেক রূপ। স্নিগ্ধ পবিত্রতায় মিলনকথা সে রূপ অনবদ্য।

ঢাকার কাজ শেষ। বংশীদা মাস্টারমশাইকে নিয়ে চলে যাবেন যশোর দিয়ে। যশোর, মাস্টারমশাইয়ের জন্মস্থান। সেই জন্মভিটের কত মধুমাখা মলিন স্মৃতির আহ্বান তিনি শুনছেন।

(সম্পাদকের সংযোজন : মাস্টারমশাই ফেরার পথে যান যশোরে নিজের গ্রাম বারইখালিতে। বহুকাল পরে যাওয়া। তাঁকে দেখতে গোটা গ্রাম পড়েছিল ভেঙে। তাঁর এক সম্পর্কিত বোন মাথায় গায়ে সস্নেহে তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন, বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল, তবু গিয়েছিলেন গ্রামের ছোট্ট নদীটিতে স্নান করতে। গ্রামের বৃদ্ধ, যুবক সকলের সঙ্গে আলাপ করেছেন। পরের দিন আসার সময় গ্রামবাসীরা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে নানা উপহার। হোক না সেসব সামান্য, মাস্টারমশাই মাথায় তুলে নিয়েছেন।) ▯ ▯

পিতৃস্মৃতি

আমার বাবা ছিলেন সকলের মাস্টারমশাই

ঋতা চক্রবর্তী

'তোরা কাজ করে যা কাজ করে যা কাজ করে যা,

ফল কি হবে ভেবে ভেবে, কে হয় মন্ত্রী কে হয় রাজা?'

সকলের প্রিয় মাস্টারমশাই, আমার বাবার জীবনব্রত ছিল গীতায় ভগবান কৃষ্ণের 'মা ফলেষু কদাচন' উপদেশের সার্থক প্রতিফলন। শিশু বয়সে মাতৃহারা হয়েছিলেন। অত্যন্ত অনাদরে এবং কষ্টভোগ করে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যিনি হয়েছিলেন সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র, ভালবাসার মানুষ। সকলেই জানেন বাবা ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শিক্ষার সকল শাখায় ছিল অবাধ বিচরণ। হাওড়া গার্লস কলেজের উপাধ্যক্ষ এবং পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ থাকাকালীন বহু অধ্যাপক তাঁদের গবেষণা কাজে পেয়েছেন তাঁর আন্তরিক সাহায্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর গবেষণার বিষয় ছিল কবি দীনেশচন্দ্র সেনের মহাকাব্য 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস,' গবেষণা পত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী বিভিন্ন জটিল বিষয় সহজ ব্যাখ্যা করে তাঁকে সাহায্য করেছেন। কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ডি.পি.জি বিদেশে গবেষণা করতে যাবেন কিন্তু তার জন্য তাঁর অঙ্ক জানার প্রয়োজন ছিল। দিনের পর দিন বাবা তাঁকে অঙ্ক করিয়েছেন। শুধু বিষয় শিক্ষা নয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ড্রইং করানো এবং তা বুঝিয়ে দিতেও দেখেছি বাবাকে। মনে প্রশ্ন ছিল একজন মানুষ এত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করলেন কিভাবে? বাবার খুব কাছে কাছে থাকতাম। সব বিষয় এমনকি খেলা, সিনেমা সব নিয়েই আলোচনা হোত। প্রশ্ন করেছিলাম 'বাবা, তোমার এই বিশাল জ্ঞানের পরিধির কারণ কি? কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে তোমার মধ্যে?' বলেছিলেন 'না, স্বাধ্যায়'। আমরা সত্যিই ছিলাম দরিদ্র। কখনও সেই কারণে চিন্তান্বিত থাকলে বাবা বলতেন, 'কিছু একটা বই নিয়ে পড়, সব চিন্তা চলে যাবে।' তাঁকে বলতে পারিনি 'আমি যে তোমার মত হয়ে উঠতে পারিনি। তোমার মেয়ে হলেও আমি যে অতি সাধারণ।'

কলেজের ছাত্রী সংসদের সঙ্গে মাস্টারমশাই। ১৯৭১ সালে গৃহীত আলোকচিত্র।

বাবা যখন কলকাতার এ. ভি. স্কুলের কাছে ব্রাহ্ম সমাজে থাকতেন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন তখন স্নাতক স্তরের শেষ পরীক্ষার জন্য টাকা জোগাড় করতে পারেননি। তাই পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। চারবছর তিনি কলেজের পড়া থেকে ছিলেন দূরে। এই সময় ছাত্র পড়াতেন সকাল, সন্ধ্যে এবং দুপুরবেলা কাটাতেন ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে বইয়ের সাথে। এই সময়ই তিনি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের ভাণ্ডার আয়ত্ত করেন। তবে যে ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল সেটা অধ্যয়নের গভীরতা এবং স্মরণে রাখার ক্ষমতা। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। স্নাতক স্তরে বিষয় ছিল অঙ্কে অনার্স এবং ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি। কিন্তু চার বছর পরে তিনি প্রাইভেটে পরীক্ষা দিলেন সংস্কৃতে অনার্স। এম. এ করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত নিয়ে গ্রুপ 'এ'। স্থান প্রথম বিভাগে দ্বিতীয়।

'সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই ভালো শিক্ষক হবেন' সবক্ষেত্রে একথা সত্য হয় না। শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ইত্যাদি সম্যকভাবে জেনে কোনও বিষয় প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে তার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বাবা যেকোনও স্তরের শিক্ষার্থীদের তাদের মতো করে বিষয় বুঝিয়ে দিতে পারতেন। শিশুদের পড়াতেও দেখেছি আবার স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের পড়াতেও দেখেছি। সেই যুগে বেশির ভাগ আদর্শ শিক্ষকের মতো তাঁর কাছেও শিক্ষকতা ছিল ব্রত। অর্থ সেখানে কোনওদিন প্রাধান্য পায়নি। নিজেই দেখেছি, তখনকার দিনে কোনও সরকারি আধিকারিকের মেয়েকে পড়িয়ে ২০০ টাকা

আবার কোনও দরিদ্র বিধবা মা মাসান্তে পায়ের কাছে একটি সিকি রেখে প্রণাম করে যেতেন। বাবা না বলতেন না কারণ ওই মায়ের বিশ্বাস গুরুদক্ষিণা না দিলে তার ছেলের পড়া সফল হবে না। সত্যিই পরে ওইছাত্র একজন প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন।

শুধু মাস্টারমশাই হিসাবে তাঁর কথা বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করতে গেলে ভাণ্ডার শেষ হবে না। কিন্তু তিনি এই শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে যে আদর্শকে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আদর্শায়িত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন তা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ। আমরা সকলেই জানি সঙ্ঘের আদর্শের মূলমন্ত্র দেশপ্রেম। দেশভাগের বেদনা কী মর্মান্তিক তা তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন। দেশভাগ হবার সময় তিনি এপার বাংলায় ছিলেন। প্রতিদিন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যে ট্রেনটা যশোহরে যেত সেটা একবার করে ছুঁয়ে প্রণাম পাঠাতেন তাঁর জন্মভিটেকে আর ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। এই বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। সঙ্ঘের সংস্পর্শে এসেছেন পরিণত বয়সে। বিচার বিবেচনা করেই সঙ্ঘময় করে তুলেছিলেন তাঁর জীবন। পরমপূজনীয় গুরুজী (মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) ছিলেন তাঁর কাছে দেবতা। তৎকালীন সমস্ত অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা বাড়িতে আসতেন শুধু বাবার সঙ্গে গল্প করতে। আমাদের ভাড়া বাড়িতে খুব সুব্যবস্থা ছিল বলা যায় না কিন্তু বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল এতটাই প্রবল যে তাঁরা বার বার আসতেন আমাদের ভাঙা বাড়িতে। বাবা শুধু পদ্য, গান, গল্প এবং অন্যান্য বিষয় লিখতেন তাই নয়। সাংসারিক এমন কোনও কাজ ছিল না যেটা বাবা পারতেন না। উল বোনা, কাপড়ে অপূর্ব রিপু করতে বাবার কাছেই শিখেছি। রান্নায় বাবা ছিলেন দ্রৌপদী-তুল্য। ছবি আঁকায় এবং গল্প বলায় তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

শাখার শিশু স্বয়ংসেবক থেকে শুরু করে তরুণ স্বয়ংসেবক, এমন কি বড়দের তিনি সঙ্ঘ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি জ্ঞানার্জনের জন্য বিষয় নির্বাচন করে আলাদা ক্লাস নিতেন সন্ধ্যেবেলা। ছোটদের জন্য গল্প, তরুণদের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ব্যাখ্যা, বড়দের জন্য শ্রীগুরুজীর চিন্তাচয়নের ক্লাস নিতেন নিয়মিত।

বাবার যে দিকটা আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষিত করত তা হল নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি। বাবা বিভিন্ন পৌরাণিক নারীচরিত্র যেমন কৈকেয়ী, মন্থরা যেভাবে ব্যাখ্যা করতেন শুনে মনে হোত আমি মেয়ে হয়েও তাঁদের এই মহত্ত্বের দিকটা কেন বুঝতে পারিনি? লেখাপড়ায় বা বহির্জগতে মেলামেশা করায় আমার মা আমার বাবার ধারেকাছেও ছিলেন না, কিন্তু আমার মা'র মতো সহধর্মিণী না হলে বাবা যে পরিপূর্ণতা পেতেন না বহুভাবে বাবা তা আমাদের বুঝিয়েছেন। সঙ্ঘকার্যে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করলেও মাকে কখনও সঙ্গে নেননি। কারণ তিনি সঙ্ঘকাজের সঙ্গে পারিবারিক কাজের সীমারেখাটা জানতেন। মাকে কখনও সঙ্গে করে কোথাও নিয়ে যাননি এই অভিমান মায়ের ছিল। ১৯৭৭ সালে জরুরী অবস্থা শেষ হলে প্রয়াগে কুম্ভমেলা এবং বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলন। সবাই যাবে। বাবা বললেন 'তোমার মাকে নিয়ে যাব।' আমাদের আনন্দের সীমা নেই। অদ্ভুত লেগেছিল এই জন্য যে, আমার বাবার মতো মানুষ যাঁর নিজের পোষাক সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই ছিল না তিনি মায়ের জামা, গরমজামা এমন কি টুপি লম্বা, মোজা সব নিজে এনে বাক্সে গুছিয়ে দিলেন। আমার মনে হয়েছে বাবার ছিল ইচ্ছামৃত্যু তাই কোনদিন, কোন তিথিতে তিনি চলে যাবেন তা নিশ্চিত জানতেন। প্রয়াগ থেকে ভগবতীজীর গাড়ীতে কাশী, গয়া দর্শন করিয়েছিলেন মাকে। আমার মা আনন্দে আপ্লুত হয়ে বাড়ি ফিরলেন বাবার সঙ্গে। বাবা যা কখনও করেননি সেবার তাই করলেন। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের ডেকে তাঁদের পা ধুইয়ে দিতে বললেন। বলেছিলেন এতে তোমাদেরও সমান পুণ্যার্জন হলো। দিনটা ছিল ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। বুঝিনি সবাইকে সব কর্তব্যকর্ম শিখিয়ে যাচ্ছেন। বললেন 'তোমার মাকে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনলাম। আর বলবে না আমি কোথাও নিয়ে যাইনি।' ৪ ফেব্রুয়ারি রবিবার মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে আমাদের জীবনে যখন সেই চরম দুর্যোগ নেমে এল, মা শুধু চিৎকার করে বলেছিলেন 'কেন আমি কাশীর বিশ্বনাথ দর্শন করতে চাইলাম, আমার বিশ্বনাথ তাই এভাবে চলে গেল।' ▯

শুভ সংবাদ!　　আনন্দ সংবাদ!

কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি (পশ্চিমবঙ্গ)

বর্ষব্যাপী বিভিন্ন জেলাতে অনেক ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সমাপ্তি অনুষ্ঠান। আগামী ১১ই ডিসেম্বর ২০১২ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫ টা থেকে ৭-৩০ মিনিট। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, স্মরণিকা উন্মোচন ও বক্তৃতামালা।

প্রধান বক্তা : পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক—শ্রী মোহনভাগবত মহাশয়।

স্থান—মহাজাতি সদন (সম্ভাব্য)।

সবার সবান্ধব, সপরিবার সাদর আমন্ত্রণ।

স্মৃতিপটে

এক আত্মস্থ মানুষ

বিজয় আঢ্য

...তারপর সেই হাঁড়ির ঢাকনা যখন খোলা হলো, তার ভেতর থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে বেরিয়ে এলো। হাঁড়ির ভেতর শুধু পড়ে রয়েছে একটা সাপের কঙ্কাল। যে হাঁড়িটাতে ভরে তিনি কালসাপটি পাঠিয়ে হুঁসিয়ারি দিতে চেয়েছিলেন, তারই এমন দশা করে সেই হাঁড়িটিই দূতের মাধ্যমে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন, কালযবন তাঁর রাজ্যকে এমন ঝাঁঝরা করে দিতে লক্ষ লক্ষ সেনা নিয়ে দ্বারকা আক্রমণ করতে আসছে।

শিলিগুড়িতে সঙ্ঘ শিক্ষা শিবিরের সান্ধ্য কার্যক্রমে এরকমভাবেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা বলছিলেন মাস্টারমশাই। আর তা শেষ হতে একজন শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবক বোধ হয় তার উৎসাহ আর চেপে রাখতে পারেনি। সটান তাঁর কাছে গিয়ে বলল, 'দাদু, কাল আবার গল্পের শেষটা বলবেন তো?' এক টিপ নস্যি নিয়ে মাস্টারমশাই স্মিত হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, বলবো বৈকি। তবে কাল এসময়ে কি আছে জানি না।'

নবাগত একজন তরুণের কাছে স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে কত আপনজন হয়ে উঠতে পারেন, সম্বোধনেই তা স্পষ্ট। বস্তুত বাইরের দিক থেকে দেখলে অনেকটা সেইরকমই। এক রসিক গুণীজনের (অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু) বর্ণনায় তাঁর এইরকম ছবিটাই ফুটে উঠেছে— "টকটকে ফর্সা রঙ, ঈষৎ সোনালি চুল, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, নস্যিলাগা নাক, নস্যিতে ঝুল-কালো ন্যাকড়ায় নাক পরিষ্কারের চেষ্টা, স্থূল চতুষ্কোণ চেহারা, ঢোলা পাঞ্জাবি, যা হাঁটুর নীচে নেমেছে, খসে-খসে পড়ছে ধুতি, তাকে কোমরে ধরে রাখার চেষ্টায় তা সামনের দিকে হাঁটুর উপরে উঠে গেছে, কিন্তু পিছনের কাছা মাটিতে লুটোচ্ছে, মুখভরা শিশু-হাসি আর চোখে আশ্চর্য দীপ্তি।"

হাওড়া গার্লস কলেজে প্রথম বি এ পাশ করা ছাত্রীদের সঙ্গে ডান দিক থেকে (দাঁড়িয়ে) প্রথম ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী ও চতুর্থ হরিপদ ভারতী।

এই মাস্টারমশাইকে প্রথম দেখি সঙ্ঘের (আর এস এস) এক বৈঠকে। ১৯৬৯ সালে কলকাতার পাথুরেঘাটার বাঙ্গুর ধর্মশালায়। যাদের দুটি শাখার দায়িত্ব ছিল এমন কার্যকর্তাদের সেখানে ডাকা হয়েছিল। তখন কাটোয়াতে মহকুমার দায়িত্ব নিয়ে সঙ্ঘের কাজ করছি। পূজনীয় শ্রীগুরুজী ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই সেই বৈঠকে মাস্টারমশাইকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাংলার প্রান্ত সঙ্ঘচালক হিসেবে ঘোষণা করলেন। বাংলায় তিনিই প্রথম প্রান্ত সঙ্ঘচালক এবং তাঁকে সঙ্ঘচালক রূপে পেয়ে বাংলা প্রদেশের সঙ্ঘের সাংগঠনিক কাঠামো তখন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল।

এম এ পরীক্ষার ফল প্রকাশের কয়েক মাস পরে হাওড়া শিবপুরের বাড়িতে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই একটু যেন ক্ষুণ্ণ স্বরেই বললেন, 'তোমার ফলাফলটা অন্যের কাছ থেকে শুনতে হলো।' লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। কিন্তু তা এই কয়েক মুহূর্তই। তারপর বরাবর যেমন কাছে টেনে নেন, এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বললেন, 'এবার কি নিয়ে কাজ করবে?' প্রশ্নটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। সঙ্ঘের কাজ তো করছিই। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মাস্টারমশায়ের দিকে তাকালাম। বললেন, 'ভূদেব বা শরৎচন্দ্রের সমাজচিন্তা নিয়ে কাজ কর।' এইভাবে মাস্টারমশায়ের নির্দেশে গবেষণা করার ইচ্ছা মনে প্রথম জেগেছিল। কিন্তু তারপর নানা কাজে তা আর তখন হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছাটা ইচ্ছাই রয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে মাস্টারমশায় প্রয়াতও হয়েছেন।

১৯৭৩ সালে সারা দেশ জুড়ে মহারাজা ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যারোহণের ত্রিশতাব্দী সমারোহ পালিত হয়েছিল। মাস্টারমশাই সেই সময় বাংলার প্রায় সব প্রমুখ শহরেই গিয়েছিলেন। আরামবাগেও গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। এই সূত্রে তিনি কামারপুকুর- জয়রামবাটীও যেতে চেয়েছিলেন। সেইমতো ব্যবস্থাও হয়েছিল। কামারপুকুরে সঙ্ঘের কাজে তখন শঙ্কর বাগ ছিল। একটা খড়ের চালের মাটির ঘরে ছিল নিবাস (সঙ্ঘ-কার্যালয়)। সেখানেই স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে এক বৈঠকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র কে কে জানে তা জানতে চাইলেন। এক-দুজন মন্ত্রটি বললও। মাস্টারমশাই বললেন, 'শাখা শেষ হওয়ার পর তোমরা এই মন্ত্র পাঠ করবে।' সেই থেকে

এখনও পর্যন্ত কামারপুকুরে শাখা শেষ হওয়ার পর এই মন্ত্রপাঠ করে স্বয়ংসেবকরা সঙ্ঘস্থান ছাড়ে।

রিষড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে হুগলী জেলার শীত শিবির হচ্ছে। স্নানের সময় হয়েছে। নরেশজীর (চতুর্বেদী) ছেলে গুড্ডু মাস্টারমশাইয়ের পিঠে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। আমরা ক'জন সেই দুই অসম-বয়সীর মজা উপভোগ করছি। এরমধ্যেই মাস্টারমশাই এক টিপ নস্যি নিয়ে নিলেন। তারপর কথায় কথায় বললেন, হুগলী জেলা বাংলাদেশের সেরা জেলা। আমাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই যে কথাটা বললেন তা একশো ভাগ সত্যি। কিন্তু শুধুই কি উৎসাহ? কৃষি-শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও গতিশীল আধুনিকতার পীঠভূমি রূপে গাঙ্গেয় উপত্যকার এই জনবহুল ক্ষুদ্র জনপদটি যে অনন্যতার দাবী রাখে তা উপেক্ষা করবে কে?

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসানে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর কলকাতায় শহীদ মিনারে স্বয়ংসেবকদের এক সমাবেশ হয়েছিল। সেই সমাবেশ যে বেশ সফল হয়েছিল তাতে কোনও দ্বিমত ছিল না। কিন্তু শেষেরও যে শেষ থাকে সেটাই পরের এক বৈঠকে মাস্টারমশাই উল্লেখ করেছিলেন। শুধু আয়োজন করা নয়, তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে তা সুষ্ঠুভাবে গুটিয়ে নেওয়ারও সাংগঠনিক কাঠামো থাকা দরকার। মাস্টারমশাই এটাকেই বললেন, 'কার্য শেষ বিভাগ।' ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট বিষয়, কিন্তু কী প্রখর সাংগঠনিক দৃষ্টি।

মাস্টারমশাই স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে একটা কথা প্রায়ই বলতেন, 'তোমাদের 'দম্বল' হতে হবে।' দুধ থেকে দই করার জন্য পাত্রে যে এক ফোঁটা রাখা হয় তাকেই বলে দম্বল। আর সেই সামান্য দইটার এতই প্রভাব যে পাত্রের পুরো দুধটাই দই হয়ে যেত। মর্মার্থ--- স্বয়ংসেবকদের সাহচর্যে সমাজের মানুষ স্বয়ংসেবকোচিত গুণের অধিকারী হয়ে উঠবে— এটাই প্রত্যাশা।

মাস্টারমশায়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা সবারই কমবেশি জানা। আমাদের প্রচলিত জানা কথাই তাঁর ব্যাখ্যায় অন্য এক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। মাস্টারমশাই বলতেন, Unity in Diversity নয়, আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Diversity in Unity। বৃক্ষই ঐক্য, মূল, শাখা-প্রশাখা, পাতা-ফুল ফল তার বৈচিত্র্য। এসবই একই বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকাশ। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা আমাদের দেশের এই বৈচিত্র্যকেই বিভেদ বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাদের এই কূট চালকে ব্যর্থ করতে হবে। সময়ের বৃত্তে মাস্টারমশায়ের সান্নিধ্য লাভ মাত্র দশ বছরের। শেষ দেখা হাওড়া স্টেশনে— মাস্টারমশাই চলেছেন কুম্ভে— অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। অনেক বাক্স-প্যাঁটরার মাঝখানে মাস্টারমশাই বসে আছেন। সেই সদাপ্রসন্ন সহাস্য মুখ। চেনা-অচেনা অনেক সহযাত্রী রয়েছেন তাঁর আশে পাশে। স্পেশাল ট্রেন ছাড়তে তখন অনেক দেরী। অগত্যা ফিরতে হয়েছিল। কে জানতো, এই দেখাই শেষ দেখা।

কলেজ ছাত্রীদের সঙ্গে সরস্বতী পুজোয় মধ্যমণি মাস্টারমশাই। বাঁ পাশে শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

পরবর্তীকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে পড়াশোনার সময় মাস্টারমশায়ের উপর তাঁর ছায়া লক্ষ্য করেছি। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও মাস্টারমশাই যুক্তিবাদী, রক্ষণশীল হয়েও উদার হৃদয়, সংসারী হয়েও অন্তরে বৈরাগ্যবান, সংস্কৃত ভাষা ও মাতৃভাষার অনুরাগী হয়েও ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতায় বিশ্বাসী। নবীন শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু আর্য হিন্দুত্বের প্রতি মমত্ববোধে প্রবীণ। হিন্দু ধর্মনীতি ও আচার তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত ভূষণ। হিন্দু সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করেই মানব সমাজের প্রতি কর্তব্য করা যায় বলে তিনি মনে করতেন। হিন্দুত্বের মানদণ্ডেই তিনি দেশের ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা করেছেন। ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, প্রগতিতে উৎসাহী মাস্টারমশাই একজন আত্মস্থ মানুষ। ▯

স্মৃতির সরণীতে

“মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক”

রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক

হ্যাঁ, তিনি নিজের নাম, যশ, খ্যাতি, বিলাসিতা, আড়ম্বর ইত্যাদি কোনও বিষয়েই কোনওদিন বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাননি। বাইরের আকার- আকৃতিতে বেঁটেখাটো এক পুরুষমানুষ হলেও ভেতরের সত্তাতে লুকিয়ে থাকতো এক বিশাল পুরুষাকার— পুরুষার্থ।

শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতাতে শ্রীভগবান পৃথিবীর যে কোনও মনুষ্যনামধারী সৃষ্টির সম্পর্কে ষোড়শ অধ্যায়ে ‘দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ’ যোগে অনেক গুণ ও অবগুণের ব্যাখ্যা করেছেন। সেই বর্ণিত মাপকাঠিতে ওই স্বল্পায়ু ব্যক্তিত্বটিকে পরিমাপ করতে গেলে সবক্ষেত্রেই দৈবগুণের পাল্লাটাই ভারী দেখা যায়।

সরলতা, অভয়, সত্ত্বগুণ, অপরের দোষ না দেখা, জ্ঞান, স্বাধ্যায়, অক্রোধ, অহং-এর অভাব, ধৈর্য, ক্ষমা প্রভৃতি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। যার অনুভব তাঁর জীবনযাত্রার ছোটবড় অনেক প্রসঙ্গে ফুটে উঠেছে। কাজপাগল, আপনভোলা, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি যেন তাঁর পুরুষাকারের দিব্য অলংকার ।

ভোজনবিলাসী ব্যক্তিটি ভোজনে অত্যন্ত রসিক ছিলেন। ১৯৭৪ সালে ছত্রপতি শিবাজীর ত্রি-শতাব্দী রাজ্যারোহণের কার্যক্রম উপলক্ষে তিনি মাথাভাঙা কোচবিহার প্রবাসে (আর এস এসের কার্যবিস্তার উপলক্ষে ভ্রমণ) গেছেন। মাথাভাঙাতে পরিবারের আতিথেয়তাতে নিষেধ করা সত্ত্বেও পায়েস-পিঠা মাত্রাতিরিক্ত সেবন। পরিণামে পরদিন পেটের গণ্ডগোলে বিছানায় আশ্রয়। সকলের একান্ত ইচ্ছা পুরোদিন যেন বিশ্রাম নেন ও পথ্যাদি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর ক্ষণিক বিশ্রামের পর সোজা নির্দেশ— “কোচবিহার আমাকে যেতেই হবে”— মাঝে বিস্তৃত মানসাই নদী পার হতে হবে। বিশাল চর পেরিয়ে তবে বাস পাওয়া যাবে। তাঁর সোজা উত্তর, “নদীর চরে হয়তো বার দুই যেতে হবে, তাই সঙ্গে ছোট বালতি আর মগ নাও”। যেমন কথা তেমনি কাজ। দুপুরে ঝিমিয়ে পড়ে, নেতিয়ে পড়া অবসন্ন শরীরটাকে কোচবিহার সঙ্ঘ-কার্যালয়ে গিয়ে ফেলে দিলেন। ভোজন-বিশ্রামের পর আবার সন্ধ্যাতে যথারীতি চনমনে অন্য এক রূপে কার্যক্রমে হাজির। স্থুল শরীরের উপর সূক্ষ্মশরীর মনের ইচ্ছার জয়জয়কার সেদিন দেখেছিলাম।

হাওড়া-কলকাতার আশেপাশে জেলাতে সঙ্ঘের কাজে প্রবাসের জন্য তাঁকে প্রায়ই যেতে হোত। কখনও কখনও সঙ্গে কোনও স্বয়ংসেবক তাঁকে সহকারী হিসাবে দেওয়া হোত। এরকম হাওড়া শহরে উৎসাহী এক স্বয়ংসেবক তাঁর সাহায্যের জন্য বরাদ্দ হোত। সে-ও বার বার যেতে চাইত, এবার গন্তব্যস্থল খড়গপুর।

হাওড়াতে ট্রেনের টিকিট কেটে তিনি ও সহযোগী বন্ধুটি পাশাপাশি বসে রওনা হলেন। পাক্কা ২ ঘণ্টা যাত্রাকালে তাঁর সুবিধা-অসুবিধে-তো দূরের কথা, তাঁরই ঘাড়ে মাথা রেখে সহকারীর টেনে ঘুম। খড়গপুর স্টেশন এলে তিনিই হাঁকডাক করে বললেন, “সঞ্জীব, বাবা ওঠ্, ওঠ্ খড়গপুর এসে গেছে।” বাঁ হাতে ঠোঁটের কোণের তরল পদার্থটা (লাল) মুছে ফেলে সঞ্জীব বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ওই বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগুতে থাকুন— আমি ব্যাগ-বোঁচকা নিয়ে ধীরেসুস্থে যাচ্ছি— দেরি হলে বাসে আমার জন্য একটা শুধু জায়গা রেখে দেবেন।” এই ছিল তাঁর যাত্রা-সহযোগী!! প্রবাস শেষে ফিরে এসে তিনি কার্যকর্তাদের বললেন— “এমন সহযোগী আর আমাকে দিও না বাপু। যাকে ঘুম থেকে তুলতে হবে। বাসে জায়গা রেখে দিতে হবে ইত্যাদি...।” কিন্তু কোনও অনুযোগ নয় বরং যেন দাদু-নাতির সম্পর্কের এক আদুরে অভিমান।

ধুতি-চাদর, চটি, রুমাল সম্পর্কে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখভাল করার এক গুরু দায়িত্ব কলেজ যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ‘খুকুদি’ (ঋতাদি, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা) চোখ চারিয়ে সব দেখভাল করতেন। কিন্তু ওই তৎপরতা বা চিরুনি তল্লাসির মাঝেও অঘটন। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে ‘খুকু’কে তলব। “হ্যাঁরে খুকু, কলেজে মেয়েগুলো বলছিল আমার মাথা থেকে নাকি কেরোসিন তেলের গন্ধ বেরুচ্ছে?” খুকু মাথা শুঁকে বলল, “ঠিক তো। আরে নারকেল তেলের কৌটার পাশে কেরোসিন তেলের একটা কৌটা থাকে— তার থেকেই একটু মাথাতে কোনওরকম মেখে নিয়েছ। আর বাবা, গন্ধ তো কোনওকিছু তোমাকে লাগবে না, নস্যির আশীর্বাদে গন্ধ নামক শব্দটি সর্বদা অনুপস্থিত।” আপনভোলার অনেক জ্বালা...।

এই লেখক বন্ধুটি তখন সবে তরুণ। কলকাতা শহরে এলেই সারাদিনে দুটো স্যারিডন ট্যাবলেট বাধ্যতামূলক। একেই গ্রামের ছেলে। তার উপর অনন্তদার ‘অনন্তলাল সোনী’ নির্দেশে পায়ে হেঁটে শিবপুর ট্রাম ডিপো থেকে ২৬ বিধান সরণী কার্যালয়ে আসতে হবে। একবার নয় বহুবার।

হঠাৎ একদিনের দায়িত্ব তাঁকে (মাস্টার মশায়কে) নিয়ে ট্যাক্সিতে করে হাওড়া থেকে ২৬নং কার্যালয়ে আসতে হবে। বিবেকানন্দ রোডে পৌঁছানোর পর ট্যাক্সির দরজা আর খুলতে পারছি না। ড্রাইভার রেগে গিয়ে বলল, “হ্যান্ডেল এদিকে নয় ওদিকে ঘোরাও— কোনওদিন ট্যাক্সি চাপেননি মনে হচ্ছে।”

সঙ্গে সঙ্গে তিনি অত্যন্ত মৃদুভাবে জবাবে বললেন, “আরে, তুমি রোজ ট্যাক্সি চড়ো আর এ গ্রামের ছেলে প্রথমবারই চাপছে— ধীরে ধীরে সব শিখে যাবে...।” মৃদুতা সরলতার কী অভিব্যক্তি। কতবার কত জায়গায় শুনেছি— ‘সরল জীবন— উচ্চ চিন্তা’ এ যেন সেসবেরই এক বিরল দৃষ্টান্ত। আজ শুধু বারবার মনে হচ্ছে— ‘পেয়ে তোমায় যদি হারাই...’ তাঁর কর্মময় জীবনের প্রেরণার দিকগুলি সম্বন্ধে তুলে ধরাই ‘শতবর্ষ উদ্‌যাপনের’ একমাত্র লক্ষ্য। তাও উদ্‌যাপন প্রস্তুতির প্রাক্কালে কত কিন্তু- পরন্তু। শেষমেশ কোনও কিছু করতে না পারা গেলেও কিছু যেন হয়ে গেল। আমার একান্ত বিশ্বাস আগাম খবর যদি তিনি পেতেন তাহলে কোনও যুক্তিতেই এইসব অহেতুক বিষয়কে তিনি হেতুর মর্যাদা কিছুতেই দিতেন না। তার প্রধান কারণ— তিনি অর্থাৎ সবার আপনজন ‘মাস্টারমশায়’— স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন অন্য কিছু নয় ‘আমাদেরই লোক’। সম্ভবত এই পরিচয়টাই দিতে তিনি সবচেয়ে ভালো- বাসতেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রথম প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রদ্ধেয় ‘মাস্টার মশায়ে’র জন্মশতবর্ষে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ সরল জীবন ও কর্মকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। ▯

মল মাস কি ও কেন?

পরম্পরা

নবকুমার ভট্টাচার্য

পঞ্জিকা মতে এবছর ১৪১৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাস মলমাস বলে বলা হয়েছে। মলমাস কি এবং কেন মলমাস হয়? মলমাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে— যদি সূর্য একরাশিতে অবস্থিত থেকে দুটি অমাবস্যাকে অতিক্রম করে তা হলে সেই মাস মলমাস রূপে খ্যাত হয়। অর্থাৎ যে মাসে দুটি অমাবস্যা সূর্যের ভিন্নরাশিতে সংক্রমণশূন্য হয়ে বর্তমান থাকে তার নাম মলমাস। স্মার্ত রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্বম্' গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে— 'অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জিতম্। মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ে। বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে।'

এই মলমাসের কারণ সম্বন্ধে জ্যোতিষতত্ত্বম্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, সূর্য প্রত্যহ তিথির ৬০ ভাগের এক ভাগ হরণ করে, এজন্য একটি ঋতুতে সম্পূর্ণ একটি তিথির ছেদ হয়। এরূপ চন্দ্রও প্রতি ঋতুতে একটি করে তিথির ছেদ করে অর্থাৎ প্রতি দু'মাসে চন্দ্র ও সূর্য কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে দুটি করে তিথির ক্ষয় হয়ে থাকে। এই হিসেবে আড়াই বৎসরের শেষে একটি করে মলমাস হয়। এই মলমাস সাধারণতঃ বৈশাখ প্রভৃতি প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই সংঘটিত হয়। আড়াই বৎসরের পর প্রথমেই বৈশাখ প্রভৃতি তিন মাসের মধ্যে একটি মলমাস হয় এবং পাঁচ বৎসরের পরে পরবর্তী মল মাসের প্রস্তুতি হয় তো শ্রাবণ প্রভৃতি মাসত্রয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। এই মলমাস চন্দ্র মাসে হয়। বচনে যে দুটি অমাবস্যার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা অমাবস্যার অন্ত্যক্ষণ অবধি কালকে বুঝতে হবে। তথাবিধ অমাবস্যাদ্বয়ের অন্ত্যক্ষণ অবধিকাল যদি সূর্যের সংক্রমণদ্বয় দ্বারা অর্থাৎ সংক্রমণ ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং উত্তরসংযোগ রূপ দুটি ক্রিয়াদ্বারা বর্জিত হয় তার নামই মলমাস। মলমাসের এরূপ লক্ষণ হওয়াতে অমাবস্যাদ্বয়ের অন্ত্যক্ষণের অব্যবহিত পূর্ব এবং পরবর্তী ক্ষণদ্বয়েও যথাক্রমে যদি সূর্যের ক্রিয়োৎপত্তি ও উত্তর সংযোগ রূপ ক্রিয়াদ্বয়ের যোগ হয় তা হলে মলমাস হবে না।

মল মাসের বিষয় স্থির করতে হলে প্রথমে মাস কয় প্রকার, তাদের লক্ষণ ইত্যাদি বিষয় জানা আবশ্যক। চান্দ্রমাসের হিসেবে মলমাস হয় এজন্য চান্দ্রমাসের বিষয় জানা আবশ্যক। তিথিঘটিত মাসই চান্দ্রমাস। চান্দ্রমাস দ্বিবিধ— মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হতে অমাবস্যা পর্যন্ত এই ত্রিংশৎ তিথিতে যে চান্দ্রমাস হয় তাই মুখ্যচান্দ্র আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ত্রিংশৎ তিথিতে যে মাস হয় তা গৌণচান্দ্র। কর্মবিশেষে কোন স্থলে মুখ্যচান্দ্র আবার কোন স্থলে গৌণচান্দ্রের উল্লেখ করতে হয়।

দুটি শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদের পূর্বক্ষণ অর্থাৎ দুটি অমাবস্যার শেষ সময়ই এক সৌরমাসে পড়লে পূর্বোক্ত সাধারণ লক্ষণানুসারে দুই মাসের এক রূপই নাম হয়। শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ হতে অমাবস্যা পর্যন্ত ত্রিংশৎ তিথি স্বরূপ মাস একটি নয় দুটি। তার মধ্যে প্রথমটি মল, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ। এজন্যই তের মাসে বৎসর হয়।

মলমাসের নিয়ম নেই। মলমাস অমুক মাসের পরে এবং অমুক মাসের পূর্বে হবে এরূপ কোনও নিয়ম নেই। মলমাস অন্য মাসকে অবলম্বন করেই অবস্থান করে। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে, অমাবস্যা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং সূর্যের সংক্রমণ বর্জিত শুক্ল প্রতিপাদাদি অমাবস্যান্ত কালরূপ চান্দ্রমাসকেই মলমাস বলে। ওই মাসে সর্ববিধ বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান বর্জনীয়।

দিন ও রাত্রির পরিমাণ ৬০ দণ্ড, তিথির মান কিন্তু গড়ে ৫৮ দণ্ড। সুতরাং গড়ে ৩০ দিনে ৩১টি তিথি হয়। এরূপে বৎসরে ১২টি তিথি অধিক পাওয়া যায়। আড়াই বৎসরে ৩০ তিথি বৃদ্ধি হয়। ৫ বছর পরে দেখা যাবে সৌর ও চান্দ্রমাসের মধ্যে ৬০ দিনের ফারাক রয়েছে, এরূপে কখন সৌর আশ্বিন মাসেও চান্দ্র বৈশাখ মাস হতে পারে। এতে মাসের যে সাধারণ লক্ষণ রয়েছে তা নিতান্ত অসঙ্গত হয়ে পড়ে। তাই ৩০টি তিথি বৃদ্ধি হলেই অমনি মলমাস হবে। আমাদের যতকিছু চান্দ্রমাস ঘটিত ক্রিয়া তা চিরকালই ৩০ দিনের মধ্যে হবে। মুখ্যচান্দ্র আশ্বিনের কার্য হয় সৌর আশ্বিনে না হয় সৌর কার্তিকে হবে। এর ব্যতিক্রম কখনই হয় না। তবে যে বৎসরে মলমাস হয়, তা থেকে তৃতীয় বৎসরে পুনরায় মলমাস হয়ে থাকে। মাঘমাস কদাচিৎ মলমাস হয়। পৌষমাস কখনই মলমাস হয় না। জ্যোতিষে সংক্রান্তিশূন্য মাসকে অধিমাস এবং দ্বিসংক্রান্তিযুক্ত মাসকে ক্ষয়মাস বলে। তবে এই ক্ষয়মাস সচরাচর সংঘটিত হয় না। কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই তিনটি মাসেই কেবল ক্ষয়মাস হয়ে থাকে, অন্য সময় হয় না এবং ওইরূপ ক্ষয়মাস স্থলে বৎসরের মধ্যে দুটি অধিমাস হতে হবে। ▯

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক'রে

মাত্র দুই মিনিটে তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,

বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

১২৫ বছরে মা সারদার স্মৃতিধন্য বৃন্দাবনের কালাবাবুর কুঞ্জ

নিমাই মুখার্জী

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পার্থিব দেহ ছেড়ে অমৃতলোকে যান ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ১৬ আগস্ট। তাঁর অদর্শনের পর শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর বিরহ বেদনাতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। শ্রীমায়ের এই অসহনীয় অবস্থা দর্শনে ভক্তপ্রবর বলরাম বসু (যাঁর স্মৃতিতে বাগবাজারে বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র খোলা হয়েছে, নাম— 'বলরাম মন্দির') ওই দুঃসহ অবস্থা থেকে মাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিছুকালের জন্য তাঁকে তীর্থাদি পর্যটনে পাঠাতে মনস্থ করেন। শ্রীমা কয়েকজন ভক্ত সেবকসহ বসুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধা-শ্যামসুন্দরের মন্দিরে অবস্থান করেন। ওই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন গুরুপ্রসাদ বসু, বলরাম বসুর পিতামহ। উনি মন্দিরে বিগ্রহের নিত্যসেবা পূজা ভোগারতির বন্দোবস্ত করেন। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীরাধামোহন বসু, বলরাম বসুর পিতা, শ্রীবৃন্দাবনে এই দেব মন্দিরে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। ওই দেবায়তনের কর্মাধ্যক্ষ (ম্যানেজার) দেখতে খুবই কালো ছিলেন বলে স্থানীয় লোকজন গুরুপ্রসাদ বসু প্রতিষ্ঠিত রাধা-শ্যামসুন্দরের দেবায়তনকে 'কালাবাবুর কুঞ্জ' নামে অভিহিত করত। তাছাড়া এই মন্দিরটি ভক্তশ্রেষ্ঠ লালাবাবু প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পাশে অবস্থিত ছিল। লোকে লালাবাবু প্রতিষ্ঠিত দেবায়তনকে বলত 'লালাবাবুর কুঞ্জ', যা আজও শ্রীধাম বৃন্দাবনে অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থান এবং বলরামবসুর পিতামহ প্রতিষ্ঠিত সেবায়তনকে বলত 'কালাবাবুর কুঞ্জ'।

শ্রীমা সারদাদেবীর ওই তীর্থযাত্রায় সঙ্গী ছিলেন গোলাপ মা, লক্ষ্মীদিদি, শ্রীম'র (কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) স্ত্রী এবং সেবকহিসাবে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ কালী (স্বামী অভেদানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ও যোগীন (স্বামী যোগানন্দ)। শ্রীমা তাঁর সঙ্গী সেবক ভক্তদের নিয়ে বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে প্রায় এক বছর সাধন ভজন করেছিলেন।

এযাবৎ শ্রীমা কাউকে 'মন্তর' (দীক্ষা) দেননি বা দিতেও চাননি। কিন্তু এই কালাবাবুর কুঞ্জেই যোগীনকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাকে স্বপ্নে আদেশ দেন এবং এই আদেশ তিনি স্বপ্নে পর পর কয়েকদিনই পান। শ্রীশ্রী ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করে শ্রীমা যোগীন মহারাজকে এখানে দীক্ষা দেন; পরবর্তীকালে যাঁর নাম হয়েছিল স্বামী যোগানন্দ।

সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তদের মধ্যে এই যোগীন মহারাজই মায়ের প্রথম মন্ত্রশিষ্য।

পরবর্তীকালে শ্রীমা আর একবার 'কালাবাবুর কুঞ্জে' এসে থেকে ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের প্রায় সবাই বৃন্দাবনে এই 'কালাবাবুর কুঞ্জে' এসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দরও এখানে আগমন হয়েছিল। এমনকি বৃন্দাবনে 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের' যে বিশাল কর্মযজ্ঞ আজ চলছে, তার শুভসূচনা এই 'কালাবাবুর কুঞ্জে' শুরু হয়েছিল ১৯০৭ সালে।

বর্তমানে এই 'কুঞ্জের' গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করে ও ভক্ত অনুরাগীদের আন্তরিক সহযোগিতায় 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম' তথা বেলুড় মঠ, এই ২০০ বছরের প্রাচীন কুঞ্জের কিয়দংশ সংগ্রহ করে এর সংস্কার করেন এবং এটিকে 'মা সারদা কুটীর' নাম দিয়ে ১২ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ শ্রীমায়ের এই কুটিরে শুভ পদার্পনের ১২৫ বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে এক বিশাল উৎসবের আয়োজন করেছেন। সেখানে উপস্থিত থাকবেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী ও আধিকারিকবৃন্দ। এছাড়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন মঠের মোহন্তগণ এবং তৎসংলগ্ন এলাকার বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ভাগবত পাঠ, পদাবলী কীর্তন, রাসলীলা বর্ণন, আলোচনা সভা প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করবেন।

'মা সারদা কুটীর' হবে ভক্তজনের অবারিত দ্বার। শ্রীধাম বৃন্দাবনে বহু দ্রষ্টব্য স্থানের সহিত 'শ্রীমা সারদা কুটীর'ও একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে অবশ্যই পরিগণিত হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবনের অন্তিমলগ্নে নরেনকে বলেছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং এই শরীরে সেই রামকৃষ্ণ'। ঠাকুর রাম ও কৃষ্ণ হলে মা সারদা অবশ্যই সীতা, শ্রীরাধা, সরস্বতী, মা কালী। বহু ভাগ্যবান ভক্তের শ্রীমাকে ওই রূপে দর্শনের সুযোগ হয়েছিল।

আমরা জানি শক্তি ও শক্তিমান অভেদ— যেমন জল ও তার তরঙ্গ, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি— একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভাবা যায় না। কাজেই মা ও ঠাকুর অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদা সম্বন্ধে বলেছেন, 'ও সারদা, সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে। এবার রূপ ঢেকে এসেছে'। ঠাকুর আরও বলেছেন, 'এ (শ্রীরামকৃষ্ণ) আর কি করেছে? তোমাকে (মা সারদাকে) এর চেয়ে ঢের বেশি করতে হবে।' কাজেই মাকে আমরা কেউই ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারিনি। যতদিন যাবে আমাদের মাতৃ-নির্ভরতা ক্রমশ বাড়বে। মা নিজেই বলেছেন, 'তোমাদের আর কেউ না থাক, জানবে একজন মা আছেন'। এই মায়ের স্নেহ আমরা বেশি করে অনুভব করব এই যুগে, যখন মানুষ যন্ত্র-নির্ভর হতে হতে ক্রমশ যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। ভালবাসা, দয়া, প্রেম, পরোপকার, সহানুভূতি প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী সমাজ থেকে উবে যেতে বসেছে। আমাদের অস্তিত্ব বর্তমানে জড় পদার্থের মতো। আমরা নামেই মানুষ কিন্তু মান- হুঁশ যুক্ত নই। কাজেই আমাদের অতীন্দ্রিয়, পরাশক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ঠিক এই সময়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে সর্ববিদ্যা স্বরূপিনী শ্রীমার পদাশ্রিত 'মা সারদা কুটীরের' শুভ উদ্বোধন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত, অনুরাগী ও আপামর অধ্যাত্মপথের পথিকদের এক নতুন আলোর দিশারী ও পরমপ্রাপ্তি। ▯

ছোটোদের প্রশিক্ষণ

ছোটোরা যেখানে আনন্দে মেতে থাকে, মাতিয়ে রাখে

সারা বছর ছোটোরা মেতে থাকে শনিবার আর রবিবার। শনিবার বিকেলে আর রবিবার সকালে ওরা হাজির হয় মহানগরীর নানা দিক থেকে। সংস্থার সম্পাদক বাসুদেব গুপ্ত একটু আগেই এসে যান। অপেক্ষা করেন ছোটোদের জন্যে। প্রত্যেকের নাম মনে রাখায় ছোটোরা খুশি। ছোটোদের আনন্দভরা মুখ দেখে তিনিও খুশি। অনেকটা পথ পেরিয়ে আসেন। দুবার অটো পাল্টাতে হয়। কোনওদিন আসতে দেরি হয় না। অভিভাবকদের চেনেন। কিন্তু তাঁদের তেমন আমল দেন না। যতটুকু সৌজন্য বজায় রাখা দরকার তা অবশ্যই রাখেন। বাসুবাবু ছোটোদের আপনজন, তাদের জন্যে অফুরন্ত ভালোবাসা। ছোটোরা আসার সঙ্গে সঙ্গে এসে যান তাঁরাও, যাঁদের উপর দায়িত্ব রয়েছে নাচ-গান আবৃত্তি-আঁকা আর নাটক শেখানোর। কিছুক্ষণের মধ্যে অঙ্গন ভরে তোলে ছোটোরা। শুরু হয়ে যায় প্রশিক্ষণ। এক একটা ঘরে গান আবৃত্তি নাটকের প্রশিক্ষণ চলে। আর উঠোনে খোলা আকাশের নিচে চলে নাচের তালিম।

চার থেকে যোল বছরের ছেলেমেয়েরা শেখে। খুব ছোটোদের পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দেয় বিজলা-মাসি। কেউ কেউ নিজেও বাঁধতে পারে। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা যখন নাচে তা দেখে মন ভরে যায়। প্রিয়াঙ্কাদি, কৃষ্ণসুহানাদি, শ্রেয়সীদি খুব ছোটোদের নাচ শেখায়। তিনজনেই একসময় ওখানে ছাত্রী ছিল। চার বছর থেকে যোল বছর শিখেছে। তারপর অন্য জায়গায় শেখার জন্যে গেছে। বাসুদেব গুপ্ত ওদের প্রশিক্ষণের জন্যে ডেকে নিয়েছেন। ওদের বলেছেন সম্পাদক, 'কখনও কাউকে তোরা বকবি না। নিজেরা ওইরকম ছোটো ছিলি— এটা ভুলিস না কখনও। ভালোবেসে শেখাতে হবে কিছু। ছোটোরা যাতে মজা পায়— সেটা দেখতে হবে সমসময়।' নাটক শেখান শঙ্করীপ্রসাদ মিত্র। বিভিন্ন বয়সের ছেলেকে তালিম দেন। মেয়েরাও অংশ নেয়। তাঁর কাছে নাটক শেখা অনেক ছেলে পরে বিভিন্ন নাট্য গোষ্ঠীতে গেছে। অভিনয়ে নাম হয়েছে তাদের। নাটক শেখানোয় শঙ্করীপ্রসাদকে সাহায্য করেন অয়নাংশু চট্টোপাধ্যায় চন্দন গুপ্ত। গান শেখে ছেলেরা, মেয়েরা। ছড়ার গান রবীন্দ্রনাথের গান নজরুলের গান গাওয়া হয়। শেখান যত্ন করে কৃষ্ণাদি, অপর্ণাদি, চয়নিকাদি,শাশ্বতীদি, স্নেহাদি। আবৃত্তি শেখান বিদিশাদি, রাসনাদি, নমিতাদি। এছাড়া রয়েছেন বিশাখাদি আর রুণুদি। ছোটোদের ছবি আঁকা শেখান সরলাদি, তিতলিদি, শ্রাবণীদি, শঙ্করদা। আরও অনেকরকম কাজে ব্যস্ত থাকে সবাই। কাজে সাহায্য করার জন্য রয়েছে দুর্গাপ্রসাদ, গণেশপ্রসাদ, মায়া হেলা।

বছরে দুবার অনুষ্ঠান হয় নগরীর এক নামী মঞ্চে। ছোটোদের অনুষ্ঠানে জমে ওঠে দারুণভাবে। প্রাক্তন ছাত্রী সোমা দে বড় চাকরি করে। সে সংস্থার শুভার্থী হিসেবে সাহায্য করে অনেকরকম। সব অনুষ্ঠানে ছোটোদের জলখাবারের ব্যবস্থা করে নিজের দায়িত্ব ও খরচে। আরও নানানভাবে সহযোগিতা করে মঞ্জুশ্রীদি, বুলবুলদি, সুবীরদা, সুশান্তদা, পবনদা, অজয়দা আর সুপ্রিয়দা। যে কোন অনুষ্ঠানে ছবি তোলে অনেকে। ছবি নেওয়ার জন্যে আগ্রহ থাকে ছোটোদের, আর তাদের বাবামায়েরও।

চার বছরের যে ছেলেটি মেয়েটি ভর্তি হয়ে একটার পর একটা বছর কাটিয়েছে, দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছে সে একসময় ভালোবেসে ফেলেছে সংস্থাকে! শেষ অনুষ্ঠানের পর ওরা কাঁদে। অনেকের প্রশ্ন, যারা ওইরকম মনভরানো

অনুষ্ঠান করল তারা কাঁদছে কেন? জানা গেল, এরপর আর তারা অনুষ্ঠান করতে পারবে না বলেই কাঁদছে।

সম্পাদক জড়িয়ে আছেন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে। এখন তাঁর বয়েস সত্তর বছর। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স ছিল তাঁর কাজ শুরুর সময়। এত বছরে সকলের কাছে তিনি 'বাসুদা'। অভিভাবকরা বলেন 'বাসুদা', সববয়সী ছেলেমেয়ে বলে 'বাসুদা'। অনেক পরিবারের তিন-পুরুষের কাছে তিনি 'বাসুদা'। ছোটোদের জন্যে ভাবনা ছাড়া আর তাঁর কোনও কাজ নেই। যখন চাকরি করতেন অফিসের কাজের পর মেতে উঠতেন শিশুমঙ্গলের বিবিধ কর্মধারায়। এখনও সেইভাবে মেতে ওঠেন। ছোটোদের জন্যে আন্তরিকভাবে চিন্তা ও কাজ করার সংস্থার বড়োই অভাব। ছোটোদের এই সংস্থার নাম : 'শিশু নাট্য গোষ্ঠী'। সম্পাদক বলেন, 'আমাদের কাজ সকলে মিলে এগিয়ে যাওয়া।'

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

বই গোছানোতেও আছে মজা

‘এসো বইগুলো সাজিয়ে ফেলি।’ অমিতাভ-স্যার ডাক দিতে ছোটোরা তৈরি। তিনি নিজে বইয়ের ধুলো ছেড়ে রেখেছিলেন নাগেশ্বর উপাধ্যায়কে নিয়ে। কিছু বাঁধাবার ব্যবস্থা করলেন।

নতুন বই চলে এলো। নতুন বইয়ের গন্ধ বেশ মন টানে। একটু বড়োদের স্মৃতিতে জড়ানো থাকে বই। ভালোলাগা বই বরাবরই সুগন্ধ ছড়ায়। বইয়ের যত্ন করতে না পারলে লেখাপড়া শেখা কঠিন। বইয়ের পাতা মোড়া ঠিক নয়। অনেকের খারাপ অভ্যেস থাকে আঙুলে থুতু দিয়ে পাতা ওল্টানোর। ওসব বন্ধ করা জরুরি। বই পড়তে পড়তে খুলে রেখে কোথাও যাওয়া ঠিক নয়। যে পাতা পর্যন্ত পড়া হয়েছে সেখানে চিহ্ন দেওয়ার জন্যে যা খুশি চাপা দেওয়া ঠিক নয়। সরু একফালি কাগজে রেখে ওঠা যায়। একে বলা হয় পেজ মার্কার। সুন্দর পেজ মার্কার দেখে পড়ার আনন্দ বাড়ে। ছুরি কাঁচি স্কেল চিরুনি পেজমার্ক হিসেবে ব্যবহার ঠিক নয়। তাতে বইয়ের ক্ষতি তো হয়ই, পাঠকেরও। আর অভ্যেসটা ভালো নয়।

বইগুলো সাজিয়ে ফেলার জন্যে ছোটোদের ডাক দেওয়ায় উৎসবের মেজাজে মেতে ওঠা সম্ভব হলো। অনেক বই নেড়ে ঘেঁটে দেখাও গেলো। ছোটোরা অনেকে টুকে রাখল ছোট্ট খাতায় কিছু বই আর লেখকের নাম। সেগুলো একে একে পড়ে নেবে ঠিক করল।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. কালীপ্রসন্ন সিংহ মূল সংস্কৃত থেকে মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন কত খণ্ডে? কত বছর লাগে? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে?

২. ভারতের সবকালের সেরা গণিতবিদ বলা হয় কাকে? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে?

৩. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু কবে? তাঁর স্থাপিত রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের নাম কি?

৪. ভারতের প্রথম দুজন মহিলা স্নাতকের নাম?

৫. ২০১২ সালের অলিম্পিকে ভারতের সংগ্রহ আসে কটি পদক? এশিয়ার কোন্ দেশ সর্বাধিক পদক পেয়েছে?

উত্তর ১. সতেরো খণ্ডে। সাত বছর (১৮৬০-১৮৬৬)। ফেব্রুয়ারি ১৮৪০, ২৪ জুলাই ১৮৭০। ২. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার রামানুজন। ২২ ডিসেম্বর ১৮৮৭-২৬ এপ্রিল ১৯২০। ৩. ২ অগাস্ট ১৮৬১-১৬ জুন ১৯৪৪। বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। ৪. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। চন্দ্রমুখী বসু। ৫. ছটি পদক। চীন।

ছোটোদের বলছি

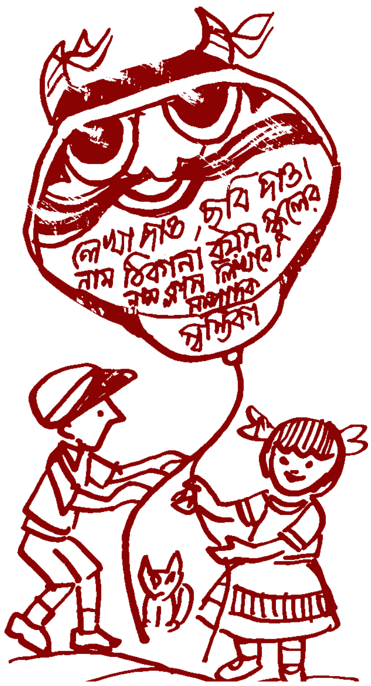

উলটো পালটা

প্রয়াসী পরিষদে মাঝেমাঝেই অনুষ্ঠান। ঘোষণা থাকে সকলকে যোগদানের। চিঠিও পাঠানো হয়। আলোচনায় গান বাজনা থাকে না। শুধু টানা বক্তৃতা শোনার লোকজন বিশেষ হয় না। বছরের সব অনুষ্ঠানের শেষে জলযোগের ব্যবস্থা থাকে না। তবে চা বিস্কুট মেলে। চা সরবরাহ করে অরুণ সাঁতরা। পরিষদের সামনে দোকান। সে চা বিতরণ করে উদার হস্তে। অনেককেই একাধিক ভাঁড় চা দেন। চায়ের হিসেব বেশি করে পেশ করতে বলেন হিসেবরক্ষক বরদা আইন। শ্রোতা হয়েছে হয়তো ৫০ জন। চায়ের হিসেব পেশ হয় ৩৫০। পঞ্চাশজনের হিসেবটা বাদ যায়। মোট তিনশটা চায়ের হিসেবের কড়ি পেয়ে যায় অরুণ। বড়জোর শ’ দেড়েক ভাঁড় দিয়ে ডবল পয়সা মিলে যায়। এরকমই চলছে বছরের পর বছর।

এছাড়া আছে খাবারদাবার। ভালোমন্দ যেমন প্যাকেটই হোক তিনশো আনা হয়। শ্রোতাদের একটা করে দেওয়ার পর সমস্ত খাবার ভাগাভাগি করে নেন কর্মীরা। আর কর্তাব্যক্তিরা। কোনও কোনও কর্মী খাবারের প্যাকেট নিয়ে যাওয়ার জন্যে বড়ো থলি আনেন। এত প্যাকেট বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর পাড়ার কোনও কোনও বাড়িতে উপহার দিলে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। আর বাড়িতে কয়েকদিন ধরে চলে। কেউ কেউ বলেন, ‘খাবারের জন্যে কাড়াকড়ি দেখে চেনা যায় কোন্ লোক কেমন। সংকটের দিনে ওদের খাদ্য বিতরণের দায়িত্ব দিলে কি কাণ্ড করবে বোঝা যায়!’

রামগরুড় সংকলিত

অঙ্গনা

ন্যায় বিচারের অন্তরালে মহিলা প্রতিবন্ধী

প্রীতি বসু

ঠেলাঠেলি করছেন কেন? একটু আস্তে যান না, সিট তো দেখতেই পেয়েছেন, চলে যান। পুরুষ যাত্রীদের বাক্যালাপে জর্জরিত হতে হতে ক্ষীণ দৃষ্টি, আর কমজোরি পা-কে টেনে নিয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণে সর্ব পিছনের প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সিটের দিকে এগিয়ে চলে চন্দনা। ঠেলাঠেলি সে করছে না, বরং ঠেলাঠেলি সে সইছেই--- এতো তার নিত্যদিনকারের অভিজ্ঞতা। তাই নীরবেই এগিয়ে চলে। জানে প্রতিবাদ করলেই হাল্কা সমবেদনাপূর্ণ স্বর, উপহাসের উচ্ছ্বাসে তলিয়ে যাবে। মহিলা প্রতিবন্ধীদের হেনস্থা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ— এ তো শুধু আজকে নয়, এ তো চিরকালের চিরাচরিত নিত্যকার ব্যাপার। খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, রক্ষকই হয় ভক্ষক। কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই যে কথাটি বলতে হয়, তা হচ্ছে— প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গবৈষম্যের প্রচলিত প্রবহমান ধারাই এর প্রধান কারণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত প্রবাদ— নারী অবলা, নারী অসহায়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে, প্রতিবন্ধী নারী সত্যিই বড় অসহায়। নারী আন্দোলনে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ঘটলেও মহিলা প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

প্রতিবন্ধী ভারতীয় মহিলাদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—

(১) পরিসংখ্যান--- সামাজিক ন্যায় নির্ধারণের একটা অন্যতম শর্ত হলো মাথাপিছু সংখ্যা গণনা। এই সংখ্যাই সমাজে কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর পরিচয় জ্ঞাপন করে তাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে। আর বিশেষভাবে বলা যায়— পরিসংখ্যান না পেলে পরিকল্পনা খাতে তাদের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ হয় না। ফলে তাদের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচারের ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে যে এই পরিসংখ্যান ব্যবস্থা ঠিকমত হচ্ছে না। ফলে বহু প্রতিবন্ধী মহিলাই সামাজিক ন্যায় বিচারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

(২) শিক্ষা— প্রতিবন্ধী মহিলাদের শিক্ষার অতীব প্রয়োজন। শিক্ষা গ্রহণের ফলেই তাদের অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। ফলে তাঁরা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তাঁরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তার প্রধান কারণ, প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কুলগুলি নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এবং এগুলির অধিকাংশই শহর বা দূর-দূরান্তে থাকে। ফলে প্রতিবন্ধী মহিলারা যাতায়াত ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কারণে ওই সকল বিদ্যালয়ে যেতে পারেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁদের নিজস্ব এক্তিয়ারে করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আইন থাকলেও পরিকাঠামোগত কারণ ও সমাজ সচেতনতার অভাবে এটি সম্ভব হয়ে উঠছে না।

(৩) নিয়োজন— শিক্ষার হার ও মান কম থাকার কারণে তাদের কর্মসংস্থানও কম। যা একটু আধটু কাজ তাঁরা পান, সেখানেও বেতন ও আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য ফুটে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলের প্রতিবন্ধী মহিলারা তো প্রায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

মহিলা প্রতিবন্ধীরা পথ, পরিবহন, ঘরদোর, শৌচাগার ইত্যাদির বাধা, আবার অবাঞ্ছিত আচরণের ভয়ের ফলে কাজের সন্ধানে স্থানান্তরিত তাঁরা হতে পারেন না। এককভাবে স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রেও চলন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য কাঁচামালের যোগান ও উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রির নানা অসুবিধা। এই সবকিছুর বাধা কাটিয়েও যাঁরা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন, তাঁরা সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত তো হনই, এমন কি তাঁদের নানান অপ্রীতিকর অবস্থারও মুখোমুখি হতে হয়।

(৪) সামাজিক অন্তর্ভুক্তি— ভারতবর্ষে প্রতিবন্ধী মহিলারা সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বাইরেই রয়ে গিয়েছেন। সমাজে অবজ্ঞা, ঘৃণা ও অমর্যাদাকর অবস্থার মধ্যেই তাঁদের অবস্থান করতে হয়। বিশেষত নানান কুসংস্কারের জন্য সামাজিক জীবনের যে বিশেষ একটি দিক— বিবাহ, তা তাঁদের বেশিরভাগ মেয়েরই হয় না। কিন্তু হীনমনা ও বিকৃত মানসিকতার মানুষের দ্বারা তাঁরা যৌন নিগ্রহের শিকার হন। এমন কি সেই সকল মানুষ নিজস্ব কলঙ্ককে ঢাকবার জন্য অসহায় প্রতিবন্ধীর প্রাণ নিতেও পিছপা হন না। সাম্প্রতিকালে গণমাধ্যম ও অন্যান্য বিশেষ সূত্রে ব্যাপারটা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

প্রতিবন্ধী মহিলাদের নানান সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের যথেষ্ট সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। তাছাড়া একাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আমাদের স্বাক্ষরও রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ফলপ্রসূ হয়নি। তাঁরা অভিশাপতুল্য যে অন্ধকার নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, সেই অন্ধকারেই নিমজ্জিত হচ্ছেন। তাঁদের সুবিধার জন্য তাদের স্বাধীনভাবে চলার জন্য তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য বহু আইন আছে। হচ্ছে, হবে। কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁরা অত্যাচারিত হলে নানান রকম প্রতিবাদ, আলাপ-আলোচনা চলে। কিন্তু সেগুলির ভাষা যথেষ্ট বলিষ্ঠ হয় না। কিছুদিন চলে, তারপর চাপা পড়ে যায়। তাঁদের দেশ থেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। এমন কি প্রাণটুকুও তাঁদের চলে যায়। বলিষ্ঠ সোচ্চার প্রতিবাদ শোনা যায় না। দেশের আইন থাকে, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে। কেঁদে মরে বিচারের বাণী।

সবশেষে বলি— দেশের প্রশাসন তথা প্রশাসকদের তো প্রতিবন্ধী নারীদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট তৎপর হতেই হবে। তবে শুধুমাত্র প্রশাসকদের উপর নির্ভর করলেই হবে না। প্রত্যেকটি মানুষকে মনুষ্যত্বপূর্ণ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ভয়কে, স্বার্থন্বেষিতাকে দূরে সরিয়ে বিবেকের সততাকে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। কথাটি কি খুবই অত্যুক্তি হলো? □

বিধানসভায় সিনেমার ডায়লগ! কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
মহাশয়া,

'অমিতাভ লালা, বাংলা থেকে পালা।' অনেক দিন পর অনেক দিন আগের মার্কসবাদী স্লোগানটা মনে পড়ে গেল। সেই যে সেই, বিমান বসুকে ধিক্কারে ধিক্কারে ভরিয়ে দিয়েছিল বাংলা। আদালত অবমাননার মামলায় জড়াতে হয়েছিল। কিন্তু দিদি আপনাকেও এবার সেই জালে ফাঁসাতে চাইছে নাকি শত্রুপক্ষরা। হ্যাঁ,

শত্রুপক্ষই। আপনার ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে আমি মনে করি রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ নেই। শত্রুপক্ষ। কিন্তু দিদি, আমি বুঝতে পারছি না আপনি হঠাৎ, এমন কেলেঙ্কারি করলেন কেন? সেদিন বিধানসভার পঁচাত্তর বছর উপলক্ষে যে সেমিনারটা হচ্ছিল তাতে তো আপনি বক্তাই ছিলেন না। হঠাৎ করে নিজের নাম নিজে ঘোষণার মতোই উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে দিলেন। বলবেন নাই বা কেন? আপনিই তো এ রাজ্যের কর্তা। ঠিক করেছেন। বেশ করেছেন। বেশি কেউ প্রতিবাদ করলেই তাকে মাওবাদী বলে দেবেন। একদম। টানুক জেলের ঘানি। আবার প্রতিবাদী! আবার মাওবাদী! ব্লকে ব্লকে কারাগার বানাবেন। কিন্তু থামবেন না দিদি। থামবেন না। আপনি থামলে বাংলা এগোবে কী করে?

আপনি সেদিন কী এমন বলেছেন? বিচারব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্র সর্বত্রই দুর্নীতি যে মূল স্তম্ভ সেটা বলে দিয়েছেন। তাতে হয়েছেটা কী? সবাই বলছে ওতে নাকি বিচারব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। আদালত অবমাননা হয়েছে। সংবিধানের অবমাননা হয়েছে। দূর সংবিধান কি অত ঠুনকো নাকি! যে কথায় কথায় অবমাননা হবে?

আচ্ছা দেখুন সেই ছেলেবেলা থেকে সিনেমায় দেখে আসছি, ঘুষ নিয়ে বিচারপতি রায় বদলে দিচ্ছে, মন্ত্রীরা দেশবিরোধী কাজ করছে। (সেখানে অবশ্য নায়কের হাতে ঠ্যাঙানিও খাচ্ছে।) তার বেলায় তো কোনও অবমাননা হয় না। আর আপনি খালি সিনেমার ডায়লগটা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন। এই তো অপরাধ! তাতে হয়েছেটা কী? দিদি যখন বলেছেন তখন বিধানসভাই দিল্লীর যন্তর-মন্তর, রামলীলা ময়দান, কলকাতার ব্রিগেড, শহিদ মিনার, শ্যামবাজার মোড়। ওটাই উত্তরা-উজ্জ্বলা-পূরবী, প্রাচী-পূর্ণ-দর্পণা।

আসলে দিদি যত মুশকিল হয়েছে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাওয়ায়। কারণ, ওই চেয়ারটার পায়াগুলো খুব ভারী। সব কথা বলা যায় না। আর বাক সংযম ব্যাপারটাই আপনার নেই। ময়দানি রাজনীতি আপনার ভিত্তি, মেঠো রাজনীতিই আপনার ভবিষ্যৎ। কিন্তু বর্তমানটা বড় বিপজ্জনক। আপনি কিছু বললেই আসলে সেটা বলে আপনার কুর্শি। বলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাই আপনার উচিত প্রতিটি শব্দ ব্যবহার করার আগে দু'পা এগিয়ে চার পা পিছিয়ে আসা। কিন্তু আপনি যে সে ধাতেরই নন।

আপনার পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রীরও সেই রোগ ছিল। কত কথা যে তাঁকে ঢোক গিলতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মাদ্রাসায় অস্ত্র ভাণ্ডার থেকে সিপিএম প্রোমোটারের দল, কত বার যে নেতাদের ধ্যাতানি খেয়েছেন তার হিসেব রাখা দুষ্কর। শেষে একটা ডায়লগ 'পেড ব্যাক ইন দেয়ার ওন কয়েন' তাঁকে প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আপনাকে এত তাড়াতাড়ি তো ছাড়ব না আমরা। লন্ডন দেখব, সুইজারল্যান্ড দেখব, গোয়া দেখব তবে না ছুটি!

আসলে এরা বোঝে না দিদি আমাদের মনের কথা চেপে রাখতে পারেন না। সেই যে আপনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি ভোটে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন, তাতে তো আসলে কেন্দ্রের সরকারের ওপর আপনার যে অনাস্থা, সেটাই প্রকাশ পেয়েছিল। এবার ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম শীর্ষ পদ মুখ্যমন্ত্রীর আসন থেকে পবিত্র আইনসভায় দাঁড়িয়ে যখন আপনি বলেন, এই দেশে টাকা দিয়ে বিচারের রায় কেনা বেচা হয় তখন গণতন্ত্রের গায়ে দিদি কালি লেগে যায়। লেগে গেছেও। মোছাও কিন্তু সহজ নয়। আইনের বিচারে এতে আপনার নিন্দা হবে কিনা জানি না, কিন্তু জনগণ গালি দেবেই। আসলে আমার মতো সবাই তো আপনার বাক্ সর্বস্বতার বড়াই করে না।

—সুন্দর মৌলিক

সংবাদপত্রের চাটুকারিতা

রণজিৎ সিংহ

সংবাদপত্র, সোজা ভাষায় 'কাগজ' শুধু প্রচারমাধ্যম নয়, জনমত সংগঠক। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি সকল বিষয়ে এই মত প্রতিফলিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের মর্যাদা কত উচ্চে তা সহজেই অনুমেয়। এই পটভূমিতেই ভারত তথা বাংলার 'কাগজে'র ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দেখি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ, নির্ভীক সাংবাদিকতা। পত্রিকায় চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, উৎপীড়নের বিবরণ প্রকাশে হরিশচন্দ্র থেমে থাকেননি! তাঁর সম্পাদকীয় কলম সমানভাবে গর্জে উঠেছিল নীলকর সাহেবদের প্রশ্রয়দাতা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিকে 'যুগান্তর' কাগজের মধ্যে দিয়ে বীর-বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অরবিন্দ ঘোষ (পরবর্তী জীবনে ঋষি শ্রীঅরবিন্দ) বিপ্লবের বাণী উচ্চকণ্ঠে, নির্ভয়ে প্রচার করে গেছেন। সংবাদজগতের এই তিন নির্ভীক-প্রাণ, নিবেদিত কর্মী ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর রক্তচক্ষুর কাছে মাথানত করেননি! ফলে তাঁরা নানা ধরনের নির্যাতন ভোগ করেন। কিন্তু, তাঁরা সুস্থ, বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার যে নিদর্শন রেখে গেছেন তা আজও অম্লান।

স্বাধীনতা-পূর্ব এই নির্ভীক, স্বচ্ছ সাংবাদিকতার ধারার পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। আমরা দেখি অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বসুমতী' ও 'যুগান্তরে' সেই সমুজ্জ্বল, উন্নতমানের সাংবাদিকতা! সত্য, নির্ভীক, নিরপেক্ষ, বলিষ্ঠ মন্তব্য প্রকাশে এই দুই সংবাদপত্রকে কখনও পেছপা হতে দেখা যায়নি! প্রশাসনের শাসকগোষ্ঠীর যেমন সমালোচনা হোত, বিরোধীরাও বাদ যেত না! এই দুটি কাগজের মধ্যে 'যুগান্তরের' বৈশিষ্ট্য— কাগজের স্বত্বাধিকারীর সন্তান ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেও তাঁর দলকে নির্বাচনে সমর্থনের জন্যে পাঠকদের কাছে আবেদন রাখা হোত না! উচ্চমানের নিরপেক্ষতাই ছিল 'যুগান্তর' ও 'দৈনিক বসুমতীর' মূলধন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমানে প্রচারিত সংবাদপত্রের ভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের গত সাধারণ নির্বাচনেই এই প্রবণতা দেখা দিয়েছে যা আজও সমানভাবে সচল। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৪ বছর বামপন্থীরা শাসন ক্ষমতায় ছিল। প্রথম দিকে এই নতুন সরকারের কার্যকলাপে লোকেরা খুবই উৎসাহী ছিল। ধীরে ধীরে এদের কাজকর্মে নাগরিকরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে! সরকারের নানা বিভাগের দুর্নীতির খবর ছড়িয়ে পড়ে ছাপার অক্ষরে এবং মুখে মুখে! স্বাভাবিক কারণেই বামপন্থীদের ক্ষমতা থেকে অপসারণের বিষয়টা এসে পড়ে। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে যে-দলের নেতা-নেত্রী, জনসাধারণের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ একটু বেশি, তাদের দিকেই সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি এসে যায়। অন্যান্য দল ও নেতারা যারা একই উদ্দেশ্যে বামপন্থী শাসনের অবসানের জন্যে লড়াই করে, তাদের সেভাবে প্রচারের আলোতে আনা হয়নি! প্রথমোক্ত দলগুলোর বক্তব্য, নেতা-নেত্রীদের ভাষণ নানা আকর্ষণীয় শিরোনামে বেরোতে দেখা গেল! শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের কথা 'সত্যাসত্য' বিচার না করে পাঠকদের সামনে উত্থাপিত হলো! এটা ঠিক দীর্ঘ বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে পর্যায়ে যাওয়া উচিত ছিল তা ঘটেনি! শাসন ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ভরে গিয়েছিল। নৈতিকতার চরম অবক্ষয় হয়েছে। কিন্তু বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গের 'কিছুই' হয়নি, একথা বলা সত্যের অপলাপ! কিন্তু সংবাদমাধ্যম দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত দল ও ব্যক্তির আশাতীত বিজয় ঘটে গেল! ব্যক্তি ও দলের প্রতি 'চাটুকারিতা' অদ্ভুতভাবে সফল হলো। বামপন্থী শাসনের অবসান ঘটল। এবার কিন্তু নব্য শাসকদের মানুষের কাছে নিজেদের কার্যকারিতা প্রমাণ করা। সেখানে কিন্তু প্রত্যাশিত কোনও সফলতা জনসাধারণ দেখতে পাচ্ছে না! প্রচারে সবধরনের সংবাদমাধ্যম নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে দিয়েছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর উৎকর্ষের পরিচয় তুলে ধরতে। অর্থাৎ 'চাটুকারিতার' ধারা নির্বাচনের আগে যে প্রবাহে চলছিল, এখনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি! কিন্তু সংবাদ-মাধ্যম হাজার চেষ্টা করেও নব্য শাসনের মহিমা জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি! কেননা যেটুকু 'পরিবর্তন' ঘটেছে, তা 'বাইরের'। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তার পরিচয় ভিন্ন। এই 'চাটুকারী সাংবাদিকতার' অবসান হয়, সংবাদজগতের কল্যাণ। ▯

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

অতিথি কলম

কাঞ্চন গুপ্ত

অসম : কংগ্রেসের জন্যই সম্ভব হয়েছে এই নীরব অনুপ্রবেশ

যখন অতিরিক্ত খারাপ জিনিস গা সওয়া হয়ে যায় তখন অল্প খারাপ বিষয় সুসংবাদ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই তথাকথিত সুসংবাদের সওদাগর হলো একদল মিডিয়া, তাদের দোসর কংগ্রেস যা প্রায় বিলুপ্তির পথে এবং যার অস্তিত্ব এখন টিকে রয়েছে দিল্লীতে ও কয়েকটি রাজ্যে। কংগ্রেস ও তার দোসর মিডিয়াদের কাছে সুসংবাদটি কী? এই সুসংবাদটি হলো : 'অসমের উপদ্রুত বোরো অঞ্চলে এক সপ্তাহ ধরে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ হওয়ার

ফলে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবারের পর সেখানে আর নতুন করে সঙ্ঘর্ষের খবর আসেনি।'

এখন চারিদিকে শান্তির নিঃশ্বাস বইবে। এখন একদল সাংবাদিক দাঙ্গা থামানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও কংগ্রেস হাইকম্যান্ড-এর প্রশংসা করে নিবন্ধ লিখতে ব্যস্ত থাকবে। (হাইকম্যান্ড বলতে তো সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীকে বোঝায় এবং এঁরা ছাড়া সরকার ও দলের অস্তিত্ব কোথায়?)

যাই হোক, মজার কথা হলো 'অসমের বোরো এলাকায় ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসছে' এই প্রচারের মতো অবাস্তব প্রচার আর কিছু হতে পারে না। দাঙ্গা বিধ্বস্ত বোরো এলাকায় অবস্থা কখনও শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল না। এক সপ্তাহ ধরে দাঙ্গার ফলে অনেকের মৃত্যু হয়েছে এবং হাজার হাজার বোরো শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। (এটা আশ্চর্যের বিষয় প্রায়ই ভারতীয়দের নিজের দেশে শরণার্থী হতে হয়।) যাই হোক, এই ঘটনা প্রমাণ করে দিসপুর ও নতুন দিল্লীতে অবস্থিত কংগ্রেস সরকারের সংখ্যালঘু তোষণের নিষ্ঠুর রাজনীতির পরিণাম।

আগামীদিনে অবশ্যই হত্যা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ বন্ধ হবে, বোরোরা যারা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছিল তারা হয়ত একদিন আবার ফিরে আসবে কিন্তু এতে করে এটা বোঝায় না যে 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরে এসেছে। বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশী মুসলমানরা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ঢুকে পড়ছে, সেখানে বসবাস করছে, কংগ্রেসীদের সাহায্যে বেআইনীভাবে নিজেদের নাম ভোটার লিস্টে ঢুকিয়ে নিয়ে রেশন কার্ড বানিয়ে নাগরিক হয়ে বসছে। এখানেই শেষ নয়। তারা অসমের উপজাতি এবং স্থানীয় লোকেদের জমি দখল করছে, তাদের প্রথা, সংস্কৃতির উপর আঘাত হানছে। ফলে আজ তারা ক্ষোভে ফুঁসছে।

এই ক্ষোভ একদিন ভীষণতায় রূপ নেয়। কিছুদিন থেমে আবার পরে কখনও মারমুখি হয়। বাংলাদেশী মুসলমানরা রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে, একসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আক্রমণ শুরু করে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট কুখ্যাত আই এম ডি টি অ্যাক্ট বাতিল করতে গিয়ে নীরব অনুপ্রবেশকে 'আক্রমণ' আখ্যা দিয়েছেন।

খবরের কাগজে ও টেলিভিশনে খবর অল্প প্রকাশিত হলেও তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা প্রমাণ করে। সেই সঙ্গে প্রমাণ করে কংগ্রেস দল বহিরাগত মুসলমানদের যৎসামান্য ভোট পাবার জন্য জাতীয় স্বার্থ কীভাবে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। এই বোধ কংগ্রেস দলের না থাকলেও অসমের মানুষের আছে, তাই তারা ক্রোধে জ্বলছে। এবং তার প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম ও ব্লগ মারফত। মজিদ রহমান নামে একজন অসমীয়া কোকারাঝাড় দাঙ্গার উপর ব্লগে জানিয়েছেন, অসম বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে গেছে। প্রতিটি কাজের মহিলা, কুলি, রিক্সাওয়ালা সবাই মিঁয়া। সরকার আসবে, সরকার যাবে কিন্তু কেউই এই অনুপ্রবেশকারীদের হটাতে পারবে না। এই অনুপ্রবেশকারীরা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গ্রামে আগুন লাগাচ্ছে এবং আরও ভয়ানক কিছু করার জন্য বদ্ধপরিকর। যদি এদের ভোটাধিকার না থাকত, যদি ভোটব্যাঙ্ক না থাকত তা হলে এমনটি হোত না।

এই ব্লগ থেকে বোঝা যাচ্ছে নীরব অনুপ্রবেশ কী ভয়ানকভাবে দীর্ঘদিন থেকে মানুষের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে চলেছে। এটা দুঃখের বিষয় যে যারা ভোটব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে হীন স্বার্থ রক্ষা করতে চায় এবং যারা মনে করে যে পবিত্র জাতীয়তাবাদ বলে কিছু নেই তারা বেআইনী অনুপ্রবেশ বিষয়টি নিয়ে পার্লামেন্টে বা অন্যত্র আলোচনা করতে দেয় না। এবং তারা তাতে সফল হয়েছে। এরা অসহনীয়কে সহ্য করাকে উদারতাবাদ বলে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। এবং ফলে নীরব অনুপ্রবেশের ব্যাপারে মানুষ কোনও প্রতিবাদ বা আন্দোলন করতে পারছে না। তাই সর্বনাশ যা হবার হচ্ছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীতে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারত শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারও ছেয়ে গেছে। এই অনুপ্রবেশের পিছনে আছে কংগ্রেস ও তার সাকরেদ সি পি এম যারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাংবিধানিকতার কথা বলে এই দুটিকে পদদলিত করার জন্য। যাই হোক, এই কপট নীতি আশ্রয় করে অসমে মুনাফা লুটছে কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গে মুনাফা লুটেছে সিপিএম। ▫

(লেখক দিল্লীর ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পাইওনীয়ারে'র সহযোগী সম্পাদক)

মুখের ক্যানসারে ভারত বিশ্বের রাজধানী

সাধন কুমার পাল

সে সময় সুমন্ত বারো বছরের। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তো। বলি বলি করে একদিন মাকে বলেই ফেলল যে সে খাবার সময় বা হাই তোলার সময় আগের মতো আর বড় করে হাঁ করতে পারে না। এই স্বাভাবিক হাঁ করতে না পারার ঘটনাটি ডাক্তারি পরিভাষায় সাবমিউকাস ফিবরোসিস (submucous fibrosis) নামক ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ বলে পরিচিত হলেও প্রথমে বাচ্চাদের খেয়াল বলে মা-বাবা কেউ বিষয়টিকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। কিন্তু মুখ গহ্বরে সাদা সাদা ঘা দেখা দিতেই সবার টনক নড়ে। স্থানীয় ডাক্তাররা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানিয়ে দিল ক্যান্সার হাসপাতাল ছাড়া এর চিকিৎসা হবে না। ঘটি-বাটি বেঁচে মুম্বাই-এর টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ওর চিকিৎসা চলতে লাগলো। টাটার ডাক্তারবাবুরা খোঁজ নিয়ে জানলেন পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকেই সুমন্ত নিয়মিত গুটখা খেত। না, নেশা দ্রব্য হিসেবে নয় স্রেফ চকোলেটের মতো মজার খাবার হিসেবে। ওর বাবার বক্তব্য, ওগুলো গুটখা বুঝব কি করে। কারণ ওগুলো যে চকোলেটের সঙ্গে চকোলেটের মতোই রংচঙে মোড়কে বিক্রি হয়। কোনওটাতে লেখা থাকে ক্যান্ডি বা চকোলেট ফ্লেভার, কোনটাতে মাউথ ফ্রেশনার অথবা পান মসলা আবার কোনটাতে ব্রেদ ফ্রেসনার। এমনও হয়েছে খুচরোর অভাবে দোকানদার চকোলেটের মতোই ছোট ছোট প্যাকেট ধরিয়ে দিলে তাতেও সুমন্ত ভাগ বসাতো।

সর্বস্বান্ত হয়ে চিকিৎসার খরচ যুগিয়েও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বাবা সুমন্তকে বাঁচাতে পারেনি। শেষের দিকে তো এমন বীভৎস চেহারা হলো যে ওর কচি টুকটুকে গাল ঘা হয়ে এতটাই খোবলা হয়ে গেল যে দাঁত সহ চোয়াল স্পষ্ট দেখা যেতো। পুত্র শোক সইতে না পেরে মা মানসিক ভারসাম্য হারালো আর বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল।

না, গুটখা আসক্তি ও এর ফল স্বরূপ ভয়ংকর পরিণতির পথে সুমন্ত একা নয়। এক সময় ধারণা ছিল একমাত্র বয়স্করাই তামাকের

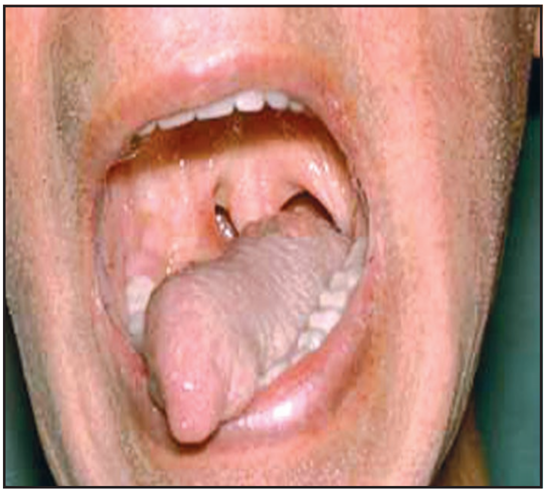

ভয়ংকর বিষের সহজ শিকার। কিন্তু আমাদের আশেপাশের স্কুলগুলির অপরিচ্ছন্ন শ্রেণিকক্ষ, উন্মুক্ত পরিসর ও পরিচ্ছন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডাস্টবিনে ছড়িয়ে থাকা রাশি রাশি গুটখা, খৈনি ও পান মসলার প্যাকেটের অস্তিত্বই বলে দেয় আমাদের নবীন প্রজন্ম এই বিষের কালো ছায়াতেই বেড়ে উঠছে। বিবিসি প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান বলছে ভারতে ৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫০ লক্ষ ছেলেমেয়ে গুটখায় আসক্ত এবং এই তামাকপ্রিয়তার জন্য এদেশে প্রতি বছর দশ লক্ষ মানুষ ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। গ্লোবাল এ্যাডাল্ট টোবাকো সার্ভের একটি রিপোর্ট বলছে প্রতি ৪ জনে ৩ জন মানুষ এই ধরনের ধোঁয়াহীন তামাকজাত দ্রব্য খেয়ে থাকে। যাদের মধ্যে প্রতি ৪ জনে ১ জন এই নেশায় আসক্ত। হু-এর (WHO) একটি পরিসংখ্যান বলছে ২০০৮-এ ভারতে নথিভুক্ত ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ছিল ৭০০০০ আর আমেরিকায় এই সংখ্যা ছিল ২৩০০০। বলার অপেক্ষা রাখে না এই সমস্ত পরিসংখ্যানই ভারতকে মুখের ক্যান্সারে বিশ্বের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার রিপোর্ট বলছে সুপারি, তামাক, খয়ের, প্যারাফিন তেল ও মিষ্টি অথবা সুস্বাদু কোনও সুগন্ধির সমন্বয়ে তৈরি গুটখায় কমপক্ষে ৩০৯৫ রকমের রাসায়নিক আছে যার মধ্যে অন্তত ২৮টি মুখ, গলা, খাদ্য নালী, পাকস্থলী, প্যানক্রিয়াস, ফুসফুস ও কিডনিতে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত। হু-এর রিপোর্ট বলছে গুটখায় রয়েছে ক্রোমিয়াম, নিকেল, আর্সেনিকের মতো ভয়ঙ্কর সব ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান। বিশেষজ্ঞরা বলছেন তামাক সেবনের ফলে শুধু ক্যান্সার নয় হার্ট ও পাকস্থলীর বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি, হাইপারটেনশন, স্ট্রোক এমনকি গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভস্থশিশু পর্যন্ত নানা সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে।

আর দশটা সমস্যা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচীর সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হবে যে গুটখা, খৈনি, পান মসলার নামে প্রত্যক্ষ তামাক সেবন যে এদেশে ধুমপানের চেয়েও বিস্ফোরক পরিস্থিতি তৈরি করছে এ ব্যাপারে শুধু আমজনতা নয় দেশের সচেতন জনসমাজও যেন ঘুমিয়ে আছে। একথা বলার পেছনে একাধিক যুক্তি আছে। যেমন এক, ধূমপানের বিষয়টি প্রচলিত মূল্যবোধ ও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠা সামাজিক বিধি নিষেধের জালে এদেশে যতটা আটকায়, আট থেকে আশির চর্ব্যচোষ্য হিসেবে প্রত্যক্ষ তামাক সেবনের বিষয়টি তার সামান্য অংশও আটকায় না। এই 'সামাজিক স্বীকৃতি' অতি অল্প দামের গুটখা, খৈনি, পান মসলাকে বই-খাতা-কলমের দোকান থেকে শুরু করে সর্বত্রই এতটাই সহজ লভ্য করে তুলেছে যে তা অতি সহজেই শিশু কিশোর বয়স থেকেই মানুষের হাতে পৌঁছে তাকে আসক্ত করে তোলে। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে দুই বছরের শিশুকে ওর ঠাকুর্দা নিজের ভাগের গুটখা

থেকে মাঝেমাঝে খাওয়ানোর ফলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে। ঠিক একই কারণে অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে খাওয়াদাওয়ার শেষে আট থেকে আশি সবার হাতে পানের বদলে পানমসলার লেবেল সাঁটা গুটখা তুলে দেওয়া সর্বাধুনিক স্টাইল বলে গণ্য হচ্ছে।

দুই, হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্য ছাড়া দেশের সিংহভাগ অংশে চর্ব্যচোষ্য তামাকের উৎপাদনে, বাণিজ্যে ও ব্যবহারে কোনও বিধিনিষেধ নেই। তবে চলতি বছর অর্থাৎ ২০১২ সাল এই চর্ব্যচোষ্য তামাক বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ এবছরের ১ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে, ২৫ মে কেরলে, ৩০ মে বিহারে, ১৩ জুলাই হিমাচলপ্রদেশে, ২০ জুলাই মহারাষ্ট্রে, ২৪ জুলাই ছত্তিশগড়ে, ২৫ জুলাই ঝাড়খন্ডে গুটখা, খৈনি, পান মসলার উৎপাদন, বাণিজ্য ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে গোয়া কারণ ওখানে ২০০৫-এর অক্টোবরেই এই নিষিদ্ধকরণ কার্যকর হয়েছে। পাঞ্জাব, অসম, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশায়ও এবছরই এই নিষিদ্ধকরণ চালু হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

আশার কথা এই যে গত ২৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং মন্ত্রী সুব্রত খুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন এ রাজ্যেও নাকি গুটখা, খৈনি, পানমসলা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে কথাবার্তা এতটাই এগিয়েছে যে এখন নাকি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে।

এতদিন গুটখা নিষিদ্ধকরণের কাজটি খুব সহজ ছিল না, সাম্প্রতিক অতীতের কয়েকটি ঘটনার দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হবে। দেশের সর্বোচ্চ তামাক আসক্ত রাজ্য (যার ৪৩ শতাংশ পুরুষ ও ১৯ শতাংশ মহিলা তামাক আসক্ত) হিসেবে মহারাষ্ট্র ২০০২ সালে একবার ও ২০০৮ সালে আরও একবার গুটখা নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গুটখা প্রস্তুতকারকদের কাছে আইনি লড়াইয়ে হেরে গিয়ে তা কার্যকর করতে পারেনি। ঠিক একই কারণে ২০০৫-এ ঝাড়খন্ড সরকার ও ২০০৭-এ রাজস্থান সরকার গুটখা নিষিদ্ধ করতে পারেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নতুনভাবে চালু হওয়া ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট (FSSA) গুটখা নিষিদ্ধ করতে সরকারের হাতে অব্যর্থ আইনি অস্ত্র তুলে দিয়েছে। কারণ সুপ্রিম কোর্টের মতে গুটখা একটি খাদ্যদ্রব্য। এই আইন অনুসারে যে কোনও ধরণের খাদ্যে তামাক বা নিকোটিন জাতীয় দ্রব্য মেশানো নিষিদ্ধ। এই ধরনের ভেজাল কোনও খাদ্য দ্রব্যে পাওয়া গেলে এই আইনের বিভিন্ন ধারা অনুসারে সেটিকে নিষিদ্ধ করা থেকে শুরু করে এর সঙ্গে যুক্তদের শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে। নতুন আইনি অস্ত্র হাতে পেয়ে চলতি বছরেই দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্য গুটখা, খৈনি, পানমসলা নিষিদ্ধ করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে সদিচ্ছা থাকলে প্রত্যক্ষ তামাক সেবনে লাগাম টানার সূচনা করা যেতে পারে।

তবে এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়ার সময় যে প্রশ্নটি বরাবর আসে তা হলো তামাক নিষিদ্ধ হয়ে গেলে হাজার হাজার তামাক চাষী ও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বেশ ভালো সংখ্যক মানুষ কাজ হারাবে সেই সঙ্গে কমবে সরকারের কর বাবদ আয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, না কেন্দ্র না রাজ্য কোনও সরকারের এমন কোনও দপ্তর নেই যার কাছে দেশ বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যে কত ধরনের তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন হয় ও বিক্রয় হয়, এই শিল্পের সঙ্গে কত মানুষের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে, কতটা স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে ন্যায্য পারিশ্রমিক ওরা কাজ করে এই সমস্ত তথ্য আছে।

২০১১ সালে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে ভারতে ২৭৫ মিলিয়ানেরও বেশি মানুষ কোনও না কোনও উপায়ে তামাক খেতে অভ্যস্ত। যাদের একসঙ্গে করলে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম জনসংখ্যার একটি নতুন দেশ হয়ে যাবে। ২০১১ সালে প্রকাশিত আরেকটি রিপোর্ট বলছে তামাক ব্যবহারের জন্য ভারতে ১৫ মিলিয়ান মানুষ দারিদ্র্য সীমার মধ্যে প্রবেশ করছে। যার সহজ অর্থ হলো তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দেশে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে সেইসঙ্গে কমবে দারিদ্র্যও। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফাইনান্স অ্যান্ড পলিসির ২০১০-এ প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে বিড়ির দাম ৫২.৮ শতাংশ বাড়িয়ে দিলে ভারতে ৪.৬ মিলিয়ন এবং সিগারেটের দাম ১৫৮ শতাংশ বাড়ালে আরও ১.৮ মিলিয়ন মানুষের অসময়োচিত মৃত্যু এড়ানো যাবে। সেই সঙ্গে সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে বাড়তি ৩৬.৯ বিলিয়ন এবং ১৪৬.৩ বিলিয়ন টাকা জমা পড়বে। তামাক শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নয়নের পরস্পর বিপরীত সম্পর্ক-এই সমস্ত পরিসংখ্যান থেকে একথা বলা যাবে কিনা এর উত্তর বিশেষজ্ঞরা দেবেন। তবে তামাক শিল্প কিছু মানুষের রুজিরুটির দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কোষাগারে যতটুকু রাজস্ব জমা করুক না কেন তা যে সুমন্তদের মতো লক্ষ লক্ষ পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ার বিনিময়ে হবে— এটা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

বিভিন্ন রাজ্যসরকার বিচ্ছিন্ন ভাবে গুটখা খৈনি পানমসলা নিষিদ্ধ করছে। সন্দেহ নেই এটি একটি ভালো উদ্যোগ। রিপোর্ট বলছে তামাক ব্যবহারের বৈচিত্র্যে ভারত বিশ্বে প্রথম। চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য হিসেবে, গন্ধ শুঁকে, মিষ্টি জাতীয় খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে, ধূমপানের মতো আরও কত উপায়ে যে এদেশে তামাক খাওয়া হয় তা বোধহয় রীতিমতো গবেষণার বিষয় হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই কোনও রাজ্য সরকার দুচার দশটি ব্র্যান্ডের তামাক মেশানো খাবার নিষিদ্ধ করলে অন্য ব্র্যান্ডগুলির চাহিদা বাড়বে। সেই সঙ্গে পাশের রাজ্যের সৌজন্যে মাহাত্ম্য বাড়বে নিষিদ্ধ ব্র্যান্ডগুলিরও। সে জন্য গুটখা, খৈনি, পানমসলা নিষিদ্ধকরণ সঠিকভাবে কার্যকর করতে হলে সমগ্র ভারতে একসঙ্গে করতে হবে। সেক্ষেত্রেও শিলিগুড়ির বাজার যেমন নেপাল থেকে কর ফাঁকি দিয়ে আসা অতি সস্তার গুটখায় ছেয়ে গেছে ঠিক তেমনি সমগ্র দেশে একসঙ্গে নিষিদ্ধ হলে চোরা পথে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা গুটখায় দেশ ছেয়ে যাবে। তাছাড়া কোনওরকম প্যাকেজিং ছাড়া স্থানীয় পদ্ধতি অনুসারে যে সমস্ত গুটখা তৈরি হয় সেগুলিকেও আইন করে বন্ধ করা সম্ভব নয়। সবমিলে বলা যায়, শুধুমাত্র আইন করে ভারতকে তামাকমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সর্বাত্মক সচেতনতা কর্মসূচী এবং তামাকশিল্পের উপর নির্ভরশীল মানুষগুলির জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থা। ▯

'পাঞ্চজন্য'-প্রকাশনীর (শাজাহান রোড। কলকাতা-১৪৪) তিনখানা বিশিষ্ট গ্রন্থ

১. **মাতৃতীর্থ শিবানীপীঠ, বারুইপুর—মানিকচন্দ্র দাস—৩০.০০**

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পবিত্র জনপদ বারুইপুরে শিবানী মায়ের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্যের কাহিনী এই গ্রন্থ। এক পুণ্যবতী নারীর দু-জন্মের সাধনা ও ভক্তিতে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের নিষ্ঠা ও আন্তরিক আকুতিতে কীভাবে দেবীর আবির্ভাব হলো, তারই বিস্ময়কর ঘটনাবলি ভক্ত ও সাধারণ মানুষের বহুদিনের নানা কৌতূহলের অবসান ঘটাবে। সুমুদ্রিত ও বহু রঙিনচিত্রে শোভিত এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

২. **গল্পে বিবেকানন্দ—মানিকচন্দ্র দাস—৩০.০০**

গল্পময় বিবেকানন্দের জীবনের শৈশব থেকে মহাপ্রয়ান পর্যন্ত নানা কাহিনি গল্পের ভঙ্গিতে বলা হয়েছে তাঁর চরিত্র্যের নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য। বৈচিত্র্যপূর্ণ, আকর্ষণীয় নানা রঙের গল্প ছোটোবড়ো সকলকে বিবেকানন্দকে জানতে সাহায্য করবে। গ্রন্থটির জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ।

৩. **এই পথ চাওয়াতেই—দুর্গা দাস—৫০.০০**

লেখিকা দুর্গা দাসের এই গ্রন্থখানি পুরাণ কাহিনি, ইতিহাস ও প্রকৃতি বর্ণনার এক ত্রিবেণী সঙ্গম। পরিবেশ অনুযায়ী শব্দচয়ন ও বর্ণনার নিপুণতায় যথার্থ সুখপাঠ্য এই গ্রন্থটি সকল পাঠক তথা ভ্রমণরসিককে তৃপ্ত করবে।

—ঃ প্রপ্তিস্থান ঃ—

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

সফল কেরিয়ার গড়তে

স্থায়ী আয়ের এক সুবর্ণ সুযোগ!!!

মাধ্যমিক পাশ যে কোন ব্যক্তি/গৃহবধূ/বেকার ভাই-বোন/কলেজ ছাত্র-ছাত্রীরা স্থায়ী আয়সহ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

ভারত সরকারের ১নং অর্থনৈতিক সংস্থা L.I.C.-র অন্যতম Chief Adviser

সোমক ব্যানার্জী — মোবাইল—৯৮৩০৪১১৬৩৫

আপনি জানেন কি??

L.I.C. তার এজেন্টদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে তা সাধারণ কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরিজীবিদের থেকে অনেক বেশি।

L.I.C.-র এজেন্টদের সুযোগ-সুবিধার কিছু অংশ

- নির্দিষ্ট একটা আয়
- গ্রাচুইটি (২ লক্ষ টাকা)
- পেনশন
- প্রতি বছর গ্যারান্টি বোনাস
- টার্ম ইনসিওরেন্স (২ লক্ষ টাকা)
- গৃহঋণ (নামমাত্র সুদের হারে)
- গাড়ি/মোটর সাইকেল কেনার জন্য ঋণ (বিনা সুদের হারে)
- ছেলে-মেয়ের জন্মদিন বা বিবাহের জন্য অগ্রিম অর্থ।

"এজেন্সী প্রফেশন" জীবনের লক্ষ থাকে না, কিন্তু এই প্রফেশন জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব জীবনে প্রতিষ্ঠার বড় বাধা।

সংশোধনাগার

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আজকাল আর 'জেল'কে (কারাগৃহ) জেল বলা হয় না। বলা হয় সংশোধনাগার। আসামীদের (যাদের মধ্যে যাবজ্জীবন দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তরাও রয়েছে) 'শাস্তি' দেওয়া নয়, বরং 'সংশোধনে'র সুযোগ দেওয়া, এমন একটা মনস্তত্ত্ব থেকেই এই সংশোধনাগারের অস্তিত্ব জাহির। তবে এই চিন্তা আদৌ ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা সে নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে বিতর্ক রয়েছে। আসলে সমাজের মানসিকতা না পাল্টালে 'জেল'কে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তা যে কারাবন্দীদের অস্পৃশ্য করে রাখার মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হবে, তা এতদিনে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। সেইসঙ্গে রক্ষণশীলেরা এই প্রশ্নও তুলতে পারেন, কারাগৃহে কি সত্যিই সাজাপ্রাপ্ত আসামীর 'সংশোধন' সম্ভব?

সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে, এমনই কয়েকজন 'আসামী'র কথা আজ বলব। যা শুনে পাঠকই বিচার করবেন 'জেল' কি সংশোধনাগার? আজ থেকে বছর আঠেরো আগে বর্ধমানে একটি রাজনৈতিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে জনৈক ব্যবসায়ীকে খুনের অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা হয় উত্থান পালের। জীবনের আলোক ওখানেই নিভতে দেননি তিনি, কারাগৃহে মোমবাতির শিখায় অনির্বাণ রেখেছিলেন তাকে। হ্যাঁ, মোমবাতির আলোতেই শুরু হয়েছিল তাঁর পড়াশুনো। শূন্য থেকে জ্ঞানের ভাঁড়ার পূর্ণ করে আজ তিনি নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ সমাপ্ত করেছেন। সেইসঙ্গে ২০১০ সালের সোনার মেডেলটিও উঠে এসেছে তাঁর গলায়।

আজ জেল থেকে মুক্ত হওয়াটা উত্থানের কাছে কোনও ব্যাপারই হয়তো নয়। কারণ কারাকর্তারা তাঁর ব্যবহার, পরিশ্রম, সততা, অধ্যবসায়ে এতটাই মুগ্ধ যে ওঁদের কথাবার্তা শুনলে কে বলবে যে উত্থান পাল একজন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামী? হ্যাঁ, একথাটাই বলছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

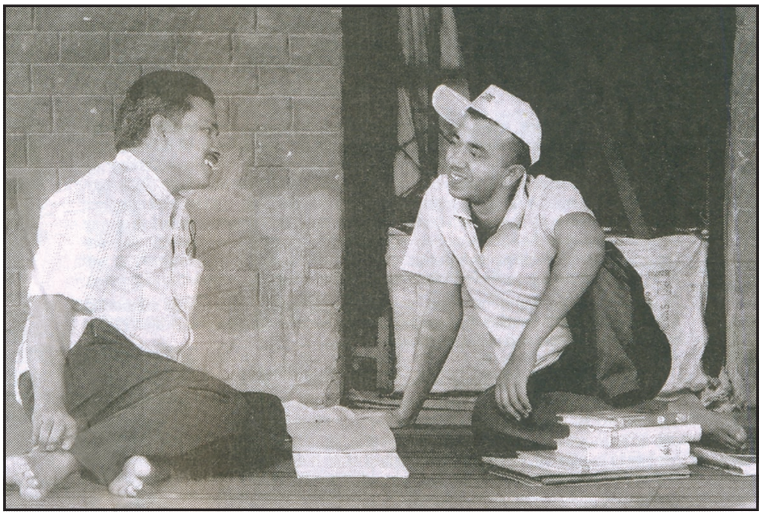

উত্থান পাল (বাঁ দিকে) সংশোধনাগারে অপর এক কয়েদীর সঙ্গে।

স্নাতকোত্তর পাঠ সমাপ্ত করে রবীন্দ্রভারতীতে গবেষণা (পি এইচ ডি)-র জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের পর নিশ্চিত ছিলেন যে সুযোগ পাবেনই। ফল আশানুরূপ না হলেও প্রথম 'অপেক্ষমান সূচী' (ওয়েটিং লিস্ট)-তে প্রথম স্থানেই থাকায় ভর্তি হওয়ার ডাক পড়ে তাঁর। কিন্তু সবাই-কে চমকে দিয়ে উত্থান যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামী শুনে পত্রপাঠ তাঁর নাম খারিজ করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই নিষ্ঠুর আচরণ ভুলবেন কী করে উত্থান? তাঁর ব্যবহারে, আচরণে আলিপুর সংশোধনাগারের কর্তারা যতই সন্তুষ্ট হোন বারংবার মুক্তির আবেদন করা সত্ত্বেও, প্রতিবার 'খারাপ প্রভাব পড়বে' এই অজুহাতে বর্ধমান পুলিশ তার বিরোধিতা করায় মুক্তির স্বপ্ন, আজও 'স্বপ্ন'-ই থেকে গিয়েছে উত্থানের।

৪৯ বছরের উৎপল মণ্ডলের ভাগ্য অবশ্য উত্থানের মতো খারাপ নয়। তিনিও খুনের সাজাপ্রাপ্ত আসামী। কিন্তু জেল থেকেই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। একটা নয়, দুটো। সোস্যাল ওয়ার্ক এবং ইতিহাসে। রাজনৈতিক বন্দী কমিটি তাঁর শিক্ষাগত নৈপুণ্যের জন্য 'মুক্তি'র সুপারিশ করেছে। শুধু তাই নয়, লালগোলায় মুক্ত বাতাস কারাগৃহে তাঁকে পাঠিয়ে পুরস্কৃতও করেছে বটে কারা-কর্তৃপক্ষ।

৩৮ বছর বয়সী বিশ্বনাথ সরকার অপর একজন খুনের আসামী। যিনি এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ভাগ্যটা অবশ্য উত্থানের মতোই। এখনও অবধি 'মুক্তি'র কোনও খবর তাঁর কানে এসে পৌঁছোয়নি। মায় ছিঁটেফোঁটা পুরস্কারও জোটেনি। কেবল 'তিরস্কার'টুকু ছাড়া। তবে এতসবের মাঝেও স্বপ্ন দেখছেন স্যোসিওলজি নিয়ে এম এ করার। কারণ হিসেবে বলছেন, জেলে থুড়ি সংশোধনাগারে যে অফুরন্ত সময়।

একই অবস্থা বিশ্বনাথ গায়েনের। তিনি অবশ্য এঁদের মধ্যে প্রবীণতম। বয়স ৭৪ বছর। খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার আগে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। ইতিহাসে এম এ ডিগ্রিটা ছিল। সংশোধনাগারের অফুরান সময়ে নিজেকে সংশোধনের পাশে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তরটাও সেরে ফেলেছেন ২০১০-এ। আপাতত 'মুক্তি'র কোনও আশা দেখছেন না। তাই অবসরে বাংলায় এম. এ-টাও করে ফেলতে চাইছেন এই বয়সেও। সঙ্গে আশা করছেন রাজনৈতিক বন্দীদের 'মুক্তি'র ব্যবস্থা করবে সরকার।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা যাক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই ধরনের মামলাগুলো খতিয়ে দেখতে একটা কমিটি গঠন করলেও কিন্তু একক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এই কমিটি আজ অবধি ব্যর্থ। গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নটা তাই এড়ানো যাচ্ছে না। সংশোধনাগারে সংশোধনের সুযোগ দোষীরা যতই নিক, সংশোধনকারী সমাজ কি তা দিতে প্রস্তুত? ☐

নেত্রদান মহাদান

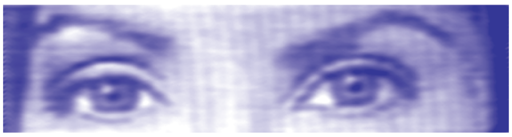

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

HB®
INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

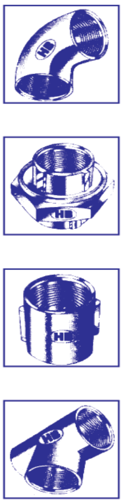

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সারা বাংলা শ্রুতিনাটক প্রতিযোগিতা

রঙ্গম

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

সম্প্রতি রিষড়া হাইস্কুলে 'কোন্নগর কথামুখ নাট্যসংস্থার' আয়োজনে সারা বাংলা শ্রুতিনাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কথামুখের সম্পাদক পার্থ মুখার্জির কথায়, ২০১০ সালে এই নাট্যসংস্থার পথচলা শুরু। ২০১২ সালে বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ওঁদের প্রযোজনা, নাটক 'বিবেক আমার' যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। শুধু নাট্য প্রযোজনাই নয়, সংস্থার পরিচালক সৌমেন মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও চালাচ্ছে কথামুখ। প্রতিযোগিতায় ছোটদের বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন— সমর চট্টোপাধ্যায়, গুরুপদ মিত্র এবং শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ভাষণে সমরবাবু বলেন, মাত্র দু'বছর বয়সেই কথামুখ যা করে দেখাচ্ছে তা অনবদ্য। সেইসঙ্গে প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, এটাকে প্রতিযোগিতা মনে না করে নাট্যচর্চা করছি এরকম মনে করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রতিযোগিতায় একষট্টিটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে ছিল, প্রতীক নাট্যসংস্থার শ্রুতিনাটক 'মহামায়া'। বৃদ্ধ কুলীন স্বামীর মৃত্যুর পর মহামায়াকে সহমরণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ভাগ্যের জোরে বেঁচে মহামায়া চলে আসে পূর্ব-প্রেমিক রাজীবের কাছে। নিজের পোড়া মুখ না দেখানোর জন্য রাজীবকে দিয়ে অঙ্গীকার করায় কোনওদিন ঘোমটা খুলে না দেখার। মেয়ের জন্মের পর এক বিবাহবার্ষিকীর রাতে রাজীব সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। মহামায়া তখনই তাদের ত্যাগ করে চলে যায়। এর বহুবছর বাদে এক চার্চের মাদাররূপে দেখা হয় মহামায়ার সঙ্গে রাজীব ও তার কন্যার। তারা মহামায়ার কাছেই আশ্রয় চায়। নাটকটি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে পাঠ করলেন শিল্পীরা।

'ইছাপুর শিল্পীলোক' পাঠ করলেন নাটক 'শেষ থেকে শুরু'। ওপার বাংলা থেকে চলে আসা গণা গানের দল বেঁধে ভিক্ষে করত। এরপর বোনের মতো ময়নার সব দায়িত্বও নিতে হয় গণাকে। নিজে সংসার না করলেও তার স্বপ্ন ময়নার বাচ্চার মুখে গানের বোল তুলিয়ে দেওয়া। গণা স্বপ্ন দেখে, তার মৃত গুরু ব্রজদা যেন ময়নার বাচ্চাকে গান শেখাচ্ছে আর ঢোলে কাঠি দিচ্ছে স্বয়ং গণা। এই স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকতে চায় গণা আর ময়না।

মুসলিম সমাজের ব্যভিচার নিয়ে 'জেনা' (ব্যভিচার) নামক একটি নাটক পাঠ করা হলো। মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মের শিক্ষা দিতে আসা মৌলবী, তাকে সেবা করতে আসা গৃহবধূ রাবিয়াকে ধর্ষণ করে। পরদিন সকালে ব্যভিচারের দায়ে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে বিচারের জন্য আনা হয়। মৌলবী তাদের একশ' ঘা বেতের আদেশ দেন। সেদিন রাতে আবার সেবা করতে আসা রাবিয়ার মধ্যে নিজের ব্যভিচারের ছায়া দেখে আতঙ্কিত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মৌলবী। নাটকটি পাঠ করলেন মুর্শিদাবাদের অন্বেষা দল।

দুর্গাপুর আবৃত্তিপরিষদ পাঠ করলেন দুই রোজগেরে মহিলার কাহিনী। ট্রেনের কামরায় এক স্কুলের দিদিমণি ও এক কাজের মাসীর কথোপকথনের মাধ্যমে দুজনের জীবনের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। দুজনেই কাজ করে খায়। দুজনের স্বামীই তাদের ছেড়ে চলে গেছে বিভিন্ন কারণে। সমাজের দুই প্রান্তে বাস করা দুই মহিলার জীবনের এই মিলের কাহিনীই, 'তুমিও আমি।'

সোদপুরের 'বিপ্রতীক' দল পাঠ করলেন নাটক, 'শোনপাপড়ি'। এক শোনপাপড়ি বিক্রেতা দাদুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় ছোট্ট বাপনের। সেই দাদুর দুঃখজনক জীবন কাহিনী গল্পাকারে লিখে স্কুলে পুরস্কৃত হয় বাপন। এরপর মস্কো থেকে সে ডাক পায় ওই গল্পটি পাঠ করার জন্য। গল্প পাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাপনের সব ভয় কেটে যায়, কারণ সে যেন দেখতে পায় শোনপাপড়ি দাদু হেঁটে আসছে তার দিকে আর সুর করে হাঁক দিচ্ছে, শো-ন-পাপড়ি। প্রতিযোগিতা শেষ হবার দুদিন পর ফলাফল ঘোষণা হয় বাংলা আকাদেমী সভাঘরে। বিশিষ্ট অতিথি বিচারপতি শ্রীমতী কল্পনা রায় বলেন, কথামুখ যে মঞ্চ তৈরি করেছে তাতে হয়তো কতো সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে।

পরিচালক সৌমেন মণ্ডল প্রতিযোগীদের উদ্দেশে অনুরোধ করেন তাদের সঙ্গে আরও সহযোগিতা করার জন্য যাতে ভবিষ্যতে আরও বড় করে প্রতিযোগিতা করা যায়।

এরপর একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে সমাপ্ত হলো শ্রুতিনাটক প্রতিযোগিতা।

সমাবেশ সমাচার

সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতিধন্য হালিশহরের গঙ্গা তীরবর্তী অসম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ (শ্রীশ্রী নিগমানন্দ আশ্রম)-এর আনুকূল্যে গত ১৬ আগস্ট শুরু হলো সংস্কৃত ভারতীর ৭ দিনের সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দু'শো প্রতিনিধি এতে যোগদান করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলুড়মঠের বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান স্বামী বেদাত্মানন্দ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, নিগমানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ বিমলানন্দ মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আমলা ও সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পৃথ্বীশ পত্রনবীশ প্রমুখ।

অখণ্ড ভারতদিবস পালন

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রাদেশিক কার্যালয় কলকাতার মানিকতলার কল্যাণভবনে গত ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত হলো 'অখণ্ড ভারত দিবস' এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের ৪০টি সমিতির মধ্যে ২১টি সমিতির ২০০ কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় মানিকতলা মহিলা সমিতি প্রথম, শিবপুর মহিলা সমিতি দ্বিতীয় এবং কুমোরটুলি মহিলা সমিতি ও কলকাতা যুব-সমিতি যৌথভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করে। এদের পুরস্কৃত করা হয়। সংগঠনের অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গুণবন্ত সিং কোঠারী অখণ্ড ভারতের ওপর বক্তব্য রাখেন।

সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতা শাখা

অন্যান্য জায়গার সঙ্গে গত ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে দক্ষিণ কলকাতায় অখণ্ড ভারত দিবস পালিত হলো। উপস্থিত ছিলেন ৬৫ জন। অখণ্ড ভারতের বিষয়ে সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতা বিভাগ কার্যবাহ প্রশান্ত চৌধুরী এবং ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্যামসুন্দর গুপ্তা বক্তব্য রাখেন। বন্দেমাতরম ও দেশাত্মবোধক গানে ছিলেন টুনটুনি দাস, অনুশ্রী হালদার ও অন্যান্যরা।

জন্মাষ্টমী : সংস্কার ভারতী

দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় ও শাখায় সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে শিশুদের 'কৃষ্ণ সাজো' প্রদর্শন, ভজন, ভক্তিমূলক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়েছে।

* * *

আর এস এসের দক্ষিণ ২৪ পরগণা বিভাগের কৃষ্ণশাখার পক্ষ থেকে নবারুণ সঙ্ঘ ভবনের সামনে ছোটদের কৃষ্ণ সাজো অনুষ্ঠান হয় এবং স্থানীয় মানুষ ও নবারুণ সঙ্ঘের সহযোগিতায় কৃষ্ণ-পূজা আয়োজিত হয়।

সংস্কার ভারতীর সঙ্গীত কর্মশালা

গত ৪ ও ৫ আগস্ট দু'দিন ব্যাপী কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সার্ধ-জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে 'দ্বিজেন্দ্রগীতি'র কর্মশালা আয়োজিত হলো কল্যাণ ভবনে। প্রশিক্ষক স্বনামধন্য শিল্পী ডঃ দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের বৈচিত্র্যময় সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে ন'টি গান অনুশীলন করান শিক্ষার্থীদের। কলকাতা, হাওড়া, দুই চব্বিশপরগণা, দুই মেদিনীপুর, আসানসোল, নদীয়া থেকে ৪২ জন বাছাই করা শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি অভিনেতা তপন গাঙ্গুলি উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৫ আগস্ট বালুরঘাটে ভারতমাতা পুজো উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবির

যোগক্ষেম-এর ‘স্বাধীন কাশ্মীরের ষড়যন্ত্র’ বিষয়ক আলোচনাচক্র

দিলীপ পদগাঁওকরের নেতৃত্বাধীন মধ্যস্থদের ধিক্কার কলকাতার

বক্তব্য রাখছেন অরুণ কুমার। রয়েছেন অজিত বিশ্বাস, এস পি মুখোপাধ্যায় ও সুনীল কল।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৮ আগস্ট যোগক্ষেম-এর উদ্যোগে ‘স্বাধীন কাশ্মীরের ষড়যন্ত্র’ শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হলো মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স বিল্ডিং-এ। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ সম্পর্ক প্রমুখ এবং জম্মু-কাশ্মীর স্টাডি সেন্টারের অধিকর্তা অরুণ কুমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাশ্মীর সভার কলকাতার সহ-সভাপতি সুনীল কল এবং বর্ডার রোডস্ অর্গানাইজেশনের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, যিনি ৫ বছরেরও বেশি সময় কর্মক্ষেত্র হিসেবে কাশ্মীরে ব্যয় করেছেন, সেই এস পি মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অজিত বিশ্বাস।

অরুণ কুমার তাঁর বক্তব্যে কাশ্মীর নিয়ে দিলীপ পদগাঁওকরের নেতৃত্বের তিন সদস্যের মধ্যস্থ দলের সুপারিশের তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, এটা আসলে কাশ্মীরের সমস্যা নয়। সমস্যা দিল্লীর। তিনি আরও বলেন, ‘‘তিনটি প্রচলিত ধারণা থেকে বেরোতে পারেনি মধ্যস্থদের দল। প্রথমত, বিচ্ছিন্নতাবাদের মিথ; দ্বিতীয়ত, কাশ্মীর বিতর্কিত স্থান এই মিথ এবং এযাবৎ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তরাই হলেন কাশ্মীরী মুসলিম— এই মিথ। আর এই মিথগুলোই মধ্যস্থদের কাছ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত। এরা জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কে কিছু না জেনে, না বুঝেই তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে গিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা যা বলেছেন, তার সবকিছু বিরোধিতা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।’’

তথ্য-পরিসংখ্যান উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন, ‘‘বিহারে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা যেখানে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ, সেখানে জম্মু-কাশ্মীরে এই হার মাত্র ৪ শতাংশ। শুধুমাত্র কাশ্মীর উপত্যকায় একজনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ নেই। অথচ কেন্দ্রীয় সহায়তা কাশ্মীরে যেখানে জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা, সেখানে বিহারে এই টাকার পরিমাণ মাত্র ৮০০ টাকা। যেহেতু কাশ্মীর মুসলিম অধ্যুষিত তাই কেন্দ্রের এই উদারতা। এর ফলে গণতান্ত্রিক অধিকারকেই পদ্ধতিগতভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে।’’ তিনি তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দশ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক স্বাধীনতার পঁয়ষট্টি বছর পরেও উদ্বাস্তু শিবিরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এরপরেও মানবিক মুখের গর্ব করা ভারতের সাজে না। ৩৭০ ধারা প্রসঙ্গে অরুণ কুমার বলেন, ‘‘সংবিধানের ১ নম্বর ধারাতেই জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতবর্ষের ১৪তম রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এনিয়ে তাই কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না। সমস্যাটাকে আসলে ভুল ব্যাখ্যা, ভ্রান্ত পথে চালনা এবং ভুলভাবে সামলানো হয়েছে। গত ১০ বছরে ১ লক্ষ কেজি আর ডি এক্স উদ্ধার হয়েছে, নিহত হয়েছেন ৫০ হাজারেরও বেশি সাধারণ মানুষ। অসংখ্য জওয়ানও নিহত হয়েছেন। এঁদের বলিদানের মূল্য দিতেই জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ করতে হবে। নইলে এই ধারার বলে আজ জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, কাল এটা নাগাল্যাণ্ড চাইবে, পরশু তামিলনাড়ু চাইবে। তাহলে হিন্দুস্থানের কি হবে? দেশের সুরক্ষা, অখণ্ডতা, একাত্মতার জন্যই ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রয়োজন।’’ সুনীল কোলও তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেন, দিলীপ পদগাঁওকার কমিটির রিপোর্ট তাঁরা প্রত্যাখ্যান করছেন। তিনি বলেন, ‘‘কাশ্মীরী পণ্ডিতরা হিন্দু হয়ে, অধিবাসীগতভাবে সংখ্যালঘু হয়ে আজ নিজভূমে পরবাসী হয়ে রয়েছেন। গত বিশ বছর ধরে হাজার হাজার খুন হয়ে গিয়েছে, শ’য়ে শ’য়ে ধর্ষণ হয়েছে, বহু মন্দির ধ্বংস হয়েছে, তবুও কি কেন্দ্র, কি রাজ্য সরকার সবাই উদাসীন। তাই এখন দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে আমাদের অসহায় অবস্থাটা তুলে ধরতে চাইছি।’’ এস পি মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে কাশ্মীরে নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। সভা সঞ্চালনা করেন নির্মাল্য ভট্টাচার্য। সভায় অন্য মাত্রা যোগ করেন কাশ্মীর সভা, কলকাতার সদস্যারা কাশ্মীরী লোকগীতি এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে।

শ্যামাপ্রসাদ-চর্চায় আরেকটি নতুন সংযোজন

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

অতি সম্প্রতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে অনেক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় তথাগত রায় মহাশয়ের ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর জীবনী। ডঃ দিবাকর কুণ্ডু লিখিত ‘রেলিভ্যান্স অফ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ’স থটস ইন দি নিউ মিলেনিয়াম’ এ সংক্রান্ত আরেকটি সংযোজন। গবেষক ডঃ কুণ্ডু সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটিতে— নানান শ্যামাপ্রসাদ— সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, জাতীয়তাবাদী শ্যামাপ্রসাদ-এর নানা দিকে কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। ডঃ কুণ্ডু দেখিয়েছেন প্রভাতকাল দেখে যেমন দিনটি কেমন হবে বোঝা যায় তেমনি শ্যামাপ্রসাদ-এর গৌরবজনক ভবিষ্যৎ বোঝা গিয়েছিল তাঁর গৌরবজনক কৈশোর ও যৌবন দেখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর সমালোচকেরা অভিযোগ করেছিলেন পিতা আশুতোষের পুত্র হবার কারণে— তাঁকে সবকটি পরীক্ষায় প্রথম করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৪ সালে হঠাৎ পিতার মৃত্যুর বছরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর কর্মকুশলতা দেখে দশ বছর পরে ১৯৩৪ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর সমালোচকেরা ততদিনে তার ভক্ত হয়ে গেছেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি উপাচার্য হন। এই বিরাট দায়িত্ব নিয়ে তিনি একের পর এক নতুন পদক্ষেপ নেন যা যুগান্তকারী এবং যার প্রাসঙ্গিকতা আজও বর্তমান। ডঃ কুণ্ডু খুব পরিশ্রম করে শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কত রকম নতুন বিষয়ের প্রবর্তন করেছিলেন তার একটি বিশদ তালিকা দিয়েছেন। (পৃ. ৬০-৬২)

মনে প্রাণে শিক্ষাবিদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন ঘটনাচক্রে। এবং সেখানেও তিনি তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৩৭ সালে বাংলায় ফজলুল হক-মুসলিম লীগের সরকার গঠিত হয়। এবং তখন থেকে শুরু হয় বাংলার হিন্দুদের উপর অত্যাচার। এই সময় জিন্না সারা ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন। কংগ্রেস নিশ্চুপ। এই মহাদুঃসময়ে হিন্দু মহাসভা নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে দাড়িয়েছিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার

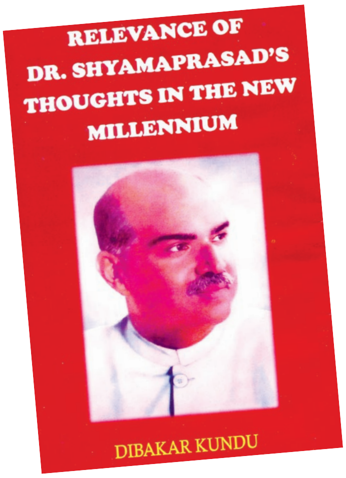

হাত থেকে বাংলা তথা ভারতকে বাঁচাতে তিনি হিন্দু মহাসভাতে যোগ দেন। অচিরেই সর্বভারতীয় নেতা হন এবং কংগ্রেস-মুসলিম লীগের যৌথ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে হিন্দু ভারতকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর সব চেষ্টা সফল হয়নি বটে তবে তিনি কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলাকে পাকিস্তানের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। সেই সঙ্গে কাশ্মীরকেও। ডঃ কুণ্ডু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর এই অবদান সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। এবং সুন্দরভাবে।

লেখক একটি বিশেষ প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন— কম্যুনিস্টদের প্রসঙ্গ। কম্যুনিস্টরা শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার প্রতিটি কাজে বাধা দিয়েছে। তারা ১৯৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গায় মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিন্দু হত্যায় নেমেছিল। এর বিস্তৃত বিবরণ সরকারি নথিতে মিলবে। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্তের জন্য যখন কলকাতা উত্তাল হয়েছিল তখন সেটি বানচাল করার জন্য কম্যুনিস্টরা ট্রাম ভাড়া বাড়ানোর আন্দোলন করেছিল। তথ্য সহযোগে এই বিষয়টি দেখানো যেত।

কিন্তু কয়েকটি কথা না বললেই নয়। লেখক একজন সুনামী গবেষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তিনি তাঁর এই গ্রন্থটিকে গবেষণা গ্রন্থ বলেছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এই গ্রন্থে খুব কমই নতুন কথা বলেছেন। দুটি নতুন কথা হলো--- (১) উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ-এর অন্তত ২৫ রকমের নতুন কাজ; (পৃ. ৬০-৬২) (২) নোয়াখালি জেলায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে সাহায্য বিতরণের তালিকা, (পৃ. ৩৫)। এছাড়া আর কোথাও গবেষণার কোনও চিহ্ন নেই। তাঁর শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে অন্য বক্তব্য সবিশেষ জানা। যে বিষয় জানা নেই সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারতেন।

১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ কুণ্ডু শ্যামাপ্রসাদ-এর হিন্দুস্থান ন্যাশানাল গার্ড তৈরির কথা বলেছেন। এই সংস্থা সম্বন্ধে খুব কম জানি। লেখক এই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারতেন তথ্য সহযোগে। সেটিই গবেষণা হোত। শ্যামাপ্রসাদ ও অন্যান্য হিন্দু মহাসভার নেতাদের দাবী অনুযায়ী সুরাবর্দী সরকার কলকাতা দাঙ্গার রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু সেটি কোনওদিন প্রকাশিত হয়নি। ডঃ কুণ্ডু হারিয়ে যাওয়া দলিল দস্তাবেজ থেকে এই রিপোর্ট খুঁজে বের করে সংক্ষেপে এই গ্রন্থে উল্লেখ করলে তা হোত গবেষণা। লেখক ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে সরকার নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ভয়ে মেদিনীপুর জেলায় নৌকা ইত্যাদি নিয়ে নেন। নেতাজীর সম্বন্ধে এই উক্তি কৌতূহল উদ্রেক করে। সরকারের কোনও রেকর্ডে নেতাজীর উল্লেখ ছিল লেখক জানালে এই উক্তির সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত হোত।

লেখক এমন একটি কথা বলেছেন যা গবেষকের লেখায় মানায় না। তিনি লিখেছেন,

ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসেছিল মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে এবং ভারত বিভাজনের লক্ষ্যে (পৃ. ৮৪-৮৫)। এই তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? ক্যাবিনেট মিশনের ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে প্রতিটি আলাপ আলোচনা লর্ড ওয়াভেল তাঁর দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া 'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার' গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। আর রয়েছে এইচ ডি হডসন লিখিত 'দি গ্রেট ডিভাইড' গ্রন্থে। এইসব গ্রন্থ এবং গান্ধী-নেহরু রচনাবলী পড়লে দেখা যাবে বৃটিশ নেতারা নন, মুসলিম নেতারা মায় কংগ্রেসী নেতারা ভারত বিভাজনে ব্যগ্র হয়েছিলেন। কংগ্রেসী ঐতিহাসিকেরা এই সত্য চেপে রাখবেন, কিন্তু অকংগ্রেসী গবেষক-ঐতিহাসিকেরা চাপবেন কেন?

নির্ভেজাল প্রশংসা গবেষকের কাছে কাম্য নয়। শ্যামাপ্রসাদ কিছু মারাত্মক ভুল করেছেন। তিনি দু-দুবার পদত্যাগ করেছেন। একবার শ্যামা-হক (ফজলুল হক) মন্ত্রিসভা থেকে, আরেক বার নেহরুর মন্ত্রিসভা থেকে। মন্ত্রিত্ব হারানোতে তাঁর গুরুত্ব কমে যায়। মন্ত্রিত্বের বাইরে থেকে তাঁর সংগ্রাম তীব্র হতে পারেনি। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে তাঁর উচিত ছিল নেহরুকে বাগে রাখা। যেমনটি প্যাটেল কংগ্রেস না ত্যাগ করে নেহরুকে বাগে রেখেছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় ভুল ছিল কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লার মোকাবিলা করতে যাওয়া। মন্ত্রিত্বে থেকে তাঁর নেহরু-আবদুল্লার মোকাবিলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হোত। তাঁর জানা উচিত ছিল আবদুল্লা কী ভয়াবহ রকমের খুনী। সেই ১৯৩০ সাল থেকে তিনি কাশ্মীর হিন্দু শূন্য করে চলেছিলেন, হিন্দুদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছিলেন, মন্দির-গুরুদোয়ারা ধ্বংস করছিলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত শেখ আবদুল্লার এই ভয়াবহ হিন্দু-শিখ হত্যার কার্যকলাপ ডঃ কুণ্ডু অল্প কথায় তথ্য সহ দেখাতে পারতেন। এটাও গবেষণা হোত।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর তৃতীয় ভুল তাঁর হিন্দু মহাসভা ছেড়ে জনসঙ্ঘ তৈরি করা। এম কে গান্ধী-হত্যায় বিচলিত হয়ে তিনি হিন্দু মহাসভা ছেড়ে যান। একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান তিনি ছিলেন যার প্রাণপুরুষ, গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছে এই অজুহাতে তা ত্যাগ করা ঠিক হয়নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পীঠস্থান হবে তাঁর নবগঠিত দল। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন কোরাণ-হাদিশে আপ্লুত মুসলমানেরা কখনও হিন্দুদের সঙ্গে বনিবনা করে থাকতে পারে না, যেমন তারা পারেনি কংগ্রেসে থাকতে।

ডঃ কুণ্ডুর গ্রন্থের সবচেয়ে বড় ত্রুটি তিনি অনেক বিষয়ের সূত্র নির্দেশ করেননি। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি অনেক গবেষণা পরিচালনা করেছেন অথচ গবেষণা কর্মের সবচেয়ে বড় অঙ্গ সূত্র নির্দেশ তা তিনি মনে রাখেননি। যেমন তিনি ৮৮ পৃষ্ঠায় অমলেশ ত্রিপাঠীর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই উক্তি কোনও গ্রন্থে বা প্রবন্ধে এবং কত পৃষ্ঠায় তা লেখেননি। লেখক ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন আই জি প্যাটেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে কাশ্মীর প্রসঙ্গ রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাঠিয়েছিলেন। এই তথ্যের সূত্র কী? ওই একই পৃষ্ঠায় লেখক লোকসভায় শ্যামাপ্রসাদ- এর একটি ভাষণের উল্লেখ করে তার সূত্র উল্লেখ করেছেন এই ভাবে— 'লোকসভা স্পিচ ১৯৫২'— যা অসম্পূর্ণ। যতদূর জানি এই লোকসভায় প্রদত্ত ভাষণ 'লোকসভা ডিবেটস' শীর্ষক গ্রন্থে থাকে। লেখকের উচিত ছিল খণ্ড বা ভলিউম ও পৃষ্ঠা সহ গ্রন্থটির সঠিক উল্লেখ করা।

ডঃ কুণ্ডু ১১৩ থেকে ১৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ প্রশ্নমালা সহযোগে এপেন্ডিক্স সন্নিবিষ্ট করেছেন। উদ্দেশ্য— যাঁদের কাছে প্রশ্নমালা পাঠানো হয়েছে তাঁদের কাছ থেকে হিন্দুধর্ম, শ্যামাপ্রসাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে মতামত জানা। বলা বাহুল্য এভাবে জানার চেষ্টা অর্থহীন। এতে বইয়ের ৫১টি পৃষ্ঠা যেমন নষ্ট হয়েছে তেমনি গুরুত্বও হারিয়েছে।

(দিবাকর কুণ্ডু, রেলিভ্যান্স অফ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ'স থটস ইন দি নিউ মিলেনিয়াম, প্রকাশক, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃঃ ১৬৪, মূল্য ২০০ টাকা।)

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

শব্দরূপ-৬৩৮ মউ ঘটক

■	১	২		■	৩	■	■
■	■		■	■	৪		৫
৬	■	৭		৮		■	
৯			■		■		
	■	■	১০	■	১১		
	■	১২				■	
১৩			■	■		■	■
■	■		■	১৪			■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বর্তমানে বিজেপি-র সভাপতি— গড়কড়ি, ৪. উপাধি বা বংশ পরিচায়ক নাম, ৭. রাত্রিতে দেখা যায় বলে চন্দ্রের এই নাম, দুয়ে চরণ, শেষ দুয়ে খাজনা, ৯. দক্ষিণা বাতাস, ১১. দীর্ঘাকৃত সুদৃশ্য ও দ্রুতগামী সওয়ারী নৌকো-বিশেষ, ১২. বেচাকেনা, ১৩. নরম ভারী ধাতুবিশেষ, ১৪. ভুল, ত্রুটি।

উপর-নীচ : ২. অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, শেষ দুয়ে হ্রাস, ৩. পৃথক, অন্য, ৫. দুর্গা, প্রথম দুয়ে ফোঁটা, তিনে চারে টাটকা নয়, ৬. মহাদেব, প্রথম দুয়ে কর্ম, ৮. শঙ্খ, শাঁক, ১০. প্রতিশব্দে ধোঁকা, ছলনা, ১১. শিংওয়ালা এক জাতের জলজ ফল, ১২. অদ্ভুত ও ভীতিকর।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩৫
সঠিক উত্তরদাতা

নিশীথ দে
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

গি	রি	জা	■	অ	ক্ষৌ	হি	ণী
নি	■	বা	ম	ন	■	■	■
■	শা	লি	■	ঘ	ণ্টা	ক	র্ণ
■	ক	■	■	■	■	ল	■
■	ন্ত	■	■	■	■	বি	■
গৌ	রী	দা	ন	■	ক	ঙ্ক	■
■	■	■	মু	গু	র	■	ধু
অ	ম্বু	বা	চি	■	ভ	বা	নী

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▫ ৬৩৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—
B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা– (সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ১০

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

জাতীয় পরম্পরার মেলবন্ধন
রূপসাগরে অরূপরতন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৯

—: উপন্যাস :—

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত □ সুমিত্রা ঘোষ □ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

—: প্রবন্ধ :—

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়। ভারতবর্ষ বনাম ইণ্ডিয়া।
তিলকের প্রথম কারাবরণ ঃ শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।
রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা ।বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ। রাষ্ট্র পরিচালনায় 'খড়ের মানুষের উপদ্রব'।
গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজম। মাধেরার সূর্যমন্দির। বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা।
সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা।

—: গল্প :—

গোপালকৃষ্ণ রায় □ রমানাথ রায় □ শেখর বসু □ জিষ্ণু বসু □ দীপঙ্কর দাস □ রত্না ভট্টাচার্য □ গোপাল চক্রবর্তী

—: রম্যরচনা :—

চণ্ডী লাহিড়ী ও পিনাকপাণি ঘোষ

—: দেবীভাবনা :—

ভিক্ষুদেব ভট্ট

এছাড়াও ভ্রমণসহ আরও অনেক কিছু। সব মিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা।

সত্ত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৬০ টাকা।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
27 August - 2012

দাম : ৭.০০ টাকা